জীবন ও মৃত্যু।

(প্রবন্ধ পুস্তক)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রণীত।

কলিকাতা, ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কাইসর যন্ত্রে

শ্রীসুবলচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত

ও

প্রকাশিত।

১৩০৭ সাল।

মূল্য ॥০

জীবন ও মৃত্যু।

১

জীবন দিবা, মৃত্যু রাত্রি—চন্দ্র-তারকাশূন্য ঘোর অমানিশি, জীবন সুখজনক, মৃত্যু ভীতিবিধায়ক, জীবন সম্মুখে, মৃত্যু দূরে, জীবন দীপশোভিত আবাসস্থান, মৃত্যু অন্ধকার অতল পর্ব্বতকন্দর, জীবনের আমি প্রভু, মৃত্যু আমার প্রভু, জীবন আমার দাস, আমি মৃত্যুর দাস; জীবন তরু-

জীবন ও মৃত্যু।

পল্লবসলিলশোভিত লোকালয়, মৃত্যু বিভীষিকাময়ী মরীচিকা, জীবন আমার সেবা করে, মৃত্যু আমায় গ্রাস করে, জীবন সুন্দর, মৃত্যু ভয়ানক।

২

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, আশ্চর্য্য কি? মহারাজা যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, 'প্রাণিগণ প্রতিদিন শমনসদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে যে চির-জীবন ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে!'* আমরা যে মরিব, এ কথা আমরা

* বনপর্ব্ব, আরণেয় পর্ব্বাধ্যায়।

জীবন ও মৃত্যু।

কখন ধারণা করিতে পারি না, ভাবিতে পারি না, বুঝিতে পারি না। অপূর্ব্ব মায়া! কি মন্ত্রেই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! কেহ যেন না বলে যে আমি মৃত্যুকে চিনিয়াছি, মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। একে ত আমরা মন্ত্রমূঢ়, তাহার উপর আরও মূঢ় হই কেন? এমন যে আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তবু আমরা মৃত্যুর আগমন দেখিতে পাই না। মুখে হাজার বলি, মৃত্যুর ভাবনা আমরা কখনই ভাবি না। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের জীবন। মরিব যদি জানিতাম

ত আমাদের চিরশত্রু কেহ থাকিত না, কাহাকেও চিরশত্রু থাকিতে দিতাম না। ছোট ছোট সুখ দুঃখ লইয়া এত কোলাহল করিতাম না, যাহা করিতেছি, তাহা চিরকালের জন্য করিতেছি, এমন কখন মনে করিতাম না, যে সব তুচ্ছ সামগ্রীকে এত বড় করিতেছি, তাহাদের এত বড করিতাম না, যে ভাবে জীবন কাটাইতেছি, এ ভাবে জীবন কাটাইতাম না।

৩

মৃত্যুকে আমরা বড় ভয় করি, এত ভয় আর কাহাকেও করি না।

জীবন ও মৃত্যু।

সাধে কি বাঙ্গালীর মেয়েরা মৃত্যুর নাম করে না, কাহাকেও করিতে দেয় না, ছেলেপুলে মরণের কথা বলিলে তাহাদের মুখে হাত দেয়, মৃত্যুব নাম শুনিলে আতঙ্কে আকুল হয়? সহজ মানুষের স্বভাবই এই। মৃত্যুর ভয়াল মূর্ত্তি দেখিতে কেমন কেহ জানে না, কেহ দেখিতে চায় না, দেখিলে হৃৎকম্প হয়। জীবিত আছ, জীবিত থাক, চিরজীবী হও, সহস্র বৎসর পরমায়ু হউক। সহস্র বৎসর—সেই কি চিরজীবন হইল? শতবর্ষজীবী মনুষ্যের পক্ষে সহস্র বর্ষ প্রায় অনন্ত জীবন।

জীবন ও মৃত্যু।

যে আশীর্ব্বাদ অশিক্ষিত স্ত্রীলোকে করে, সেই আশীর্ব্বাদের আশায় প্রাচীন কালে মুনিঋষিরা, রাজা প্রজা, কত দীর্ঘ তপস্যা, কত কঠোর সাধনা করিতেন। আর্য্যেরা দেবতার নিকট শ্রেষ্ঠ বর অমরত্ব। ইহার অধিক আর কিছু দান করিবার ছিল না, ইহার অধিক আর কিছু প্রার্থনীয় ছিল না। অসীমক্ষমতাশালী মহাপুরুষগণ একমাত্র অমরত্বের আশায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতেন, শরীর মনকে পীড়িত করিতেন, অসংখ্য ক্লেশ স্বীকার করিতেন। নিষ্কাম তপস্যা কয় জন করিত?

জীবন ও মৃত্যু।

কেহ ইন্দ্রত্বের আশায়, কেহ ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার আশায়, কেহ শত্রুর বিনাশ জন্য, কেহ অমরত্বের জন্য তপস্যা করিত। অমরত্বই তপস্যার চরম ফল। বহুযুগব্যাপিনী তপস্যা, ষষ্ঠিসহস্র বৎসর পরিমিত আরাধনা, সম্ভাবনার অতীত কি না, সে কথা বিচার করিবার আবশ্যক নাই। মূলে সেই একই কারণ দেখিতে পাইতেছি—মৃত্যুভীতি। দীর্ঘ জীবনের অর্থ আর কিছু নহে, কেবল মৃত্যুকে যথাসাধ্য দূরে রাখা।

৪

আত্মা নিত্য, এ কথা প্রাচীন তপস্বীরাও মানিতেন। আত্মা যদি নিত্য, তাহা হইলে যাহা আছে, তাহাই পাইবার জন্য এত যত্ন কেন? এক উত্তর এই যে, আত্মার মুক্তির জন্য তপশ্চরণ কর্ত্তব্য। জীবন অতি দুশ্ছেদ্য মোহবন্ধন। তপস্যা সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায়। শুদ্ধ আত্মা জীবনের অশুদ্ধ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, সেই কুজ্ঝটিকাকে অপসারিত করার নামই তপস্যা। আত্মার বিনাশ নাই সত্য, কিন্তু আত্মার অবনতি

আছে। শুদ্ধ আত্মা নহিলে শুদ্ধব্রহ্মে লীন হইবে না। জীবনমৃত্যুর অশেষ দুঃখ ক্রমাগত ভোগ করিতে হইবে, নানা জীবযোনি পরিগ্রহ করিতে হইবে। ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ অমর আত্মা ব্রহ্ম হইতে দূর পরিভ্রষ্ট হইবে। যাহা তাঁহার অংশ, তাহা তাঁহাকে পুনঃসমর্পণ করা কর্ত্তব্য। আমরা আত্মার রক্ষক মাত্র, যিনি আত্মার প্রভু তাঁহাকে যথাসময়ে তাঁহার সামগ্রী প্রত্যর্পণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। নিষ্কাম তপস্যা এইরূপে আচরিত হইতে পারে। মনুষ্যের প্রধান এবং শেষ গতি তপস্যা। সংসারকলঙ্কিত

জীবন ও মৃত্যু।

আত্মাকে বিশুদ্ধ করিবার অন্য উপায় নাই, শ্রেষ্ঠ মানব তপশ্চরণ ব্যতীত আর কিছু করিতে পারে না, এই জন্য সে তপস্যা করিবে।

এ ভাবের তপস্যা অত্যন্ত বিরল। অধিক সংখ্যক তপস্বীরা অমরত্বলাভের জন্যই তপস্যা করিতেন—আত্মার অমরত্ব নহে, এই নশ্বর শরীরের অমরত্ব। শরীর অর্থে কেবল এক প্রকারের অবয়ব নহে। যাহাকে আমার আমি বলি, প্রকৃত অর্থে সেই আমার শরীর। তপস্বীরা ইহারই চিরজীবন প্রার্থনা করিতেন। আত্মা অমর হইলেও

জীবন ও মৃত্যু।

আমাদেব আয়ত্ত নহে। চেতনা আমাদের আয়ত্ত। চির-চেতনাই অমরত্বেব বব। বিস্মৃতিব বিনাশই এই অর্থে অমবত্ব। আমাকে আমি চিবকাল চিনিব, যখন যেমন ইচ্ছা মাংস অস্থিব শবীব পবিগ্রহ কবিব, যখন ইচ্ছা ত্যাগ কবিব, কিন্তু স্মৃতি আমাকে কখন পবিত্যাগ কবিবে না। মৃত্যু নামক যে ভয়ঙ্কর বিস্মৃতি, আমি যেন কখন তাহার অধীন না হই। সরস্বতীব তীরে দাঁড়াইয়া আমি বেদ উচ্চারণ করিয়াছি, সামগান করিয়াছি, সে যেন কালিকার কথা। বিশ্বামিত্র,

জীবন ও মৃত্যু।

পরাশর, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের শরীরের পুণ্যজ্যোতিঃ আমি দেখিয়াছি, তাঁহাদের মুখে বেদমন্ত্র প্রথম শ্রবণ করিয়াছি। বাল্মীকি বনে বনে বেড়াইতেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সীতাদেবীর চরণ দর্শন করিয়াছি, অশোকবনে তাঁহার অশ্রুসিক্ত মলিনমুখ দেখিয়াছি, রামচন্দ্রের কমলনয়নবিভাসিত প্রশান্ত মুখমণ্ডল, হনূমানের বীর্য্য, লক্ষ্মণের ভক্তি, দশাননের বিকটমূর্ত্তি, সব দেখিয়াছি। বেদব্যাসের প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখ হইতে মহাভারতের অপূর্ব্ব কাব্যস্রোত যখন জলন্ত অগ্নিস্রোতের ন্যায়

প্রবাহিত হইত, তখন সেই কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমার শরীর কণ্টকিত হইত। মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ আসন্ন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে অত্যন্ত গভীরার্থপূর্ণ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমি সেই সময়েই শ্রবণ করিয়াছিলাম। বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। মহাপুরুষ খৃষ্টের মৃত্যুর সময় আমি সেই স্থলে উপস্থিত ছিলাম। মহম্মদের আবির্ভাব কালে আমি আরব্য দেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, চৈতন্যের অশ্রু-পূর্ণ মত্ততায় আমার চক্ষে নদী বহিত।

জীবন ও মৃত্যু।

মহাকবি হোমর দ্বারে দ্বারে গান করিয়া বেড়াইতেন, আমি কত বার পথে দাঁড়াইয়া তাঁহার গান শুনিতাম। দান্তের দুঃখ দেখিয়া আমি কাতর হইতাম, সেক্ষপীয়র নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থাকিয়া এমন অপূর্ব্ব নাটকাবলী রচনা করিতেন, আমি দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। মিল্টন অন্ধ হইলে তাঁহার মুখের শান্তি কত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কালিদাসের দ্রুত রচনায় এবং অসাধারণ কবিত্বশক্তিতে সভাশুদ্ধ লোক মোহিত হইত, আমি রাজসভায় অনেক সময় উপস্থিত থাকিতাম।

আমি সব দেখিয়াছি, সব দেখিব। মানুষ আসিতেছে, যাইতেছে, সেই অবিশ্রাম যাতায়াত দেখিতেছি। দেখি নাই কেবল মৃত্যু। কখনও যে দেখিতে হইবে, সে ভয়ও নাই। আমি অমর। চক্রাকারে এই পৃথিবী—এই বিশ্বমণ্ডল ঘূর্ণিত হইতেছে, আমি তাহার উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। কালের তরঙ্গ, বিস্মৃতির তরঙ্গ, পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ প্রতিনিয়ত জগতে আসিয়া লাগিতেছে, কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছু তীরে ফেলিয়া যাইতেছে। কেবল আমায়

স্পর্শ করিতে পারে না। মৃত্যু আমার চারি পার্শ্বে, কিন্তু আমি অমর, বিস্মৃতি আমাকে বেষ্টন করিয়াছে, কিন্তু আমাকে বাঁধিতে পারে নাই। মানুষ যাহাকে অত্যন্ত ভয় করে, অথচ কোনও মতে যাহার হাত এড়াইতে পারে না, আমি তাহাকেই পরাভূত করিয়াছি।

৫

মানুষ মৃত্যুর হাত এড়াইয়া কোনও মতে অমর হইতে পারে, এই বিশ্বাস চিরকালই জগতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের তপস্বিগণই শ্রেষ্ঠ উপায় অবলম্বন করিতেন।

জীবন ও মৃত্যু।

তপস্যা করিলে কেহ অমর না হউক, তাহার জীবন ত পবিত্র হইবেই। দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইবে, সংসার-ভোগের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে, চিত্তশুদ্ধি জন্মিবে, আত্মা ব্রহ্মে অর্পিত হইবে। দীর্ঘ অথবা অনন্ত জীবনের জন্য বহুবিধ উপায় লোকপরম্পরায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দ্রব্যগুণে জীবন দীর্ঘ হয়, এ বিশ্বাস সাধারণ লোকের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। পক্ক হরীতকীর সন্ধানে এখনও অনেকে ভ্রমণ করে। পৃথিবীর অন্য খণ্ডেও এইরূপ দ্রব্যগুণে অমর হয়, এ বিশ্বাস

জীবন ও মৃত্যু।

আপামরসাধারণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও সময় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও এই বিশ্বাস বলবান হয়। অমৃত, সোমরস পান কবিলে তাহাকে মৃত্যু স্পর্শ কবিতে পাবে না, প্রাচীনকালে ভাবতবর্ষেও এরূপ প্রবাদ ছিল। সম্প্রতি আবার অমর হইবাব ইচ্ছাব বড বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তিব্বতে অমরাশ্রম সিদ্ধান্ত করিয়া, এখন অনেকে তদভিমুখে যাত্রা করিবার মনন করিয়াছেন। এমন চিরকালই হইয়া আসিতেছে, কখন কম, কখন বেশী। কখনও

জীবন ও মৃত্যু।

লোকে মৃত্যুর কাছে হার মানিয়া জীবনকে লইয়া ব্যস্ত থাকে, কখনও জীবনের ধ্বজা তুলিয়া মৃত্যুকে সংহার করিতে অগ্রসর হয়। অমর হইবার আশায় কখনও সোমরস, কখনও অমৃত পান করে, কখনও বনে যায়, কখনও তিব্বতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হয়। কিছু দিন লোকে ক্ষান্ত হয়, আবার কিছুদিন পরে অমর হই-বার চেষ্টায় ফেরে। একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ চেষ্টা শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট উভয়বিধ মনুষ্যের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভাশালী

জীবন ও মৃত্যু।

আর্য্য ঋষিগণ অমরত্বের অন্বেষণ করিতেন, অল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সেই চেষ্টা করে।

আত্মার অমরত্ব আর এ অমরত্বে প্রভেদ আছে, সহজেই বুঝা যাইতেছে। আত্মা অমর, এ কথা সহজেই স্বীকার করিলেও মৃত্যুর ভয় অথবা পরলোকের অনিশ্চিততা হ্রাস হয় না। স্বর্গ, নরক অথবা পরলোকের অন্য কোনও প্রকার কল্পনা গ্রহণ করা না করা স্বেচ্ছাধীন। স্বর্গ নরকের জন্য যে কেহ চিরজীবী হইতে চায়, এমন বোধ হয় না। সে অমরত্ব

জীবন ও মৃত্যু।

মনুষ্য-আত্মার প্রাপ্য, তাহাব জন্ম কামনা কবিতে হয় না। এই পৃথিবীর সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ রাখিবার জন্মই, স্মৃতিকে চিবজাগরূক রাখিবার জন্যই, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা।

অমর হওয়া কি মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব? এই রক্তমাংসের শরীব, এই অস্থিমজ্জামেদোনির্ম্মিত, রোগাশ্রিত, ক্ষণিক দেহ কি চিরস্থায়ী হইতে পারে? জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, এই নিয়ম বটে। শরীর ধারণ করিলেই শরীর ত্যাগ করিতে হইবে। **কিন্তু এমন নিয়ম নাই, যাহার ব্যত্যয়**

ঘটে না। নাই কি? প্রতিদিন প্রাতে সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইবে, এ নিয়মের কি ব্যতিক্রম সম্ভব? প্রলয়ের সময় ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাও ত নিয়ম-বহির্ভূত নহে। সূর্য্যোদয়ের নিয়মে যদি কোনও ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে জীবনের পরেই যে মৃত্যু, এ নিয়মেরও ব্যত্যয় ঘটিতে পারে। বিশ্বাসের মূল এই রূপে উৎপন্ন হয়।

মনুষ্যশরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইবেই, এরূপ সহস্র প্রমাণ থাকিলেও তাহার বিরুদ্ধে যে যুক্তি চলে না, এমন নহে। কিন্তু যুক্তির অপেক্ষা বিশ্বাস, বাসনা

অধিক প্রবল। মানুষ যে চিরকাল বাচিয়া থাকিতে পারে, এ কথা যুক্তি-সঙ্গত না হইলেও মানুষ চিরকাল বাঁচিতে ইচ্ছা করে, চিরকাল বাচিতে পারা যায়—এরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। এই বিশ্বাস, এই প্রবল আকাঙ্ক্ষাই অমরত্বের মূল। মৃত্যুর বিষয়ে মানুষ কিছু জানিতে পারে না, সেই জন্য সে মৃত্যুকে এত ভয় করে। মানুষ মরিল, তাহার দেহ বিসর্জ্জন দিলাম। কিন্তু যে সেই দেহকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যে সেই দেহের মধ্যে অবস্থান করিত, সে কোথায়

জীবন ও মৃত্যু।

গেল? কোথায় যে গেল, তাহা কোনও মতেই জানা যায় না, কখনও জানা গেল না, কখনও জানা যাইবে না। এই জন্য কেহ মরিতে চায় না। অজানিতকে মানুষে এতই ভয় করে। মৃত্যু কি আমরা যদি জানিতাম, তাহা হইলে হয় ত মৃত্যুকে আমরা ভয় করিতাম না, অমর হইবার জন্য এত আগ্রহ হইত না। আত্মা অমর, এ কথায় মন প্রবোধিত হয় না, যদি এই জগৎ, এই জীবনের সহিত কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না রহিল, ত অমর হইলাম কিসে?

৬

পুনর্জন্ম এই প্রসঙ্গে মনে আসিতেছে। জীব মরিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ বিশ্বাসও অনেক স্থানে, কালভেদে লক্ষিত হয়। যুরোপের বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ যে আজ বলিতেছেন এক প্রাণী হইতে আর এক প্রাণী উৎপন্ন হয়, ইহাও প্রকারান্তরে পুনর্জন্মমাত্র। ডারুইন শরীরতত্ত্বের কথা বলিতেছেন, প্রাচীনেরা আত্মার কথা বলিতেন। ডারুইন প্রমাণ করেন, শূকর হইতে ক্রমে ক্রমে হস্তী উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ শূকরের

জীবন ও মৃত্যু।

অবয়ব কালক্রমে বহু পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধনের পর হস্তীর আকার ধারণ করিয়াছে। পুনর্জন্মবাদী বলিবেন যে, যে আত্মা মনুষ্যের শরীরে বাস করে, সেই আত্মা মনুষ্যের পাপের ফলস্বরূপ জন্মান্তরে কোনও নীচ প্রাণীর দেহে অধিষ্ঠান করিবে। মনুষ্য পুণ্যাচরণ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। শেষ এমন হইয়াছে যে, লোকে বিশ্বাস করে যে, কাশীধামে মরিলে আর পুনর্জন্ম হইবে না। চিরকাল পাপ করিয়া কাশীতে গিয়া যদি কেহ মরিতে

পারে, তাহা হইলেই তাহার মুক্তি হইল।

জীবন কি এমনি দুর্ব্বহ ভাব যে, মানুষে তাহা পুনঃপুনঃ বহন করিতে চায় না? জীবন এবং মৃত্যু বারম্বার না দেখিতে হয়, এমন কামনা সকলে করে কেন? জন্মমরণের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য মানুষ এত লালায়িত কেন? মানুষ মরিয়া কোনও নিকৃষ্ট প্রাণীর দেহ ধারণ করিবে, সেই এক ভয়, বারম্বার মানুষ মনুষ্যদেহই ধারণ করিবে, তাহাও ভয়ের কথা। এ স্থলে জীবনের ভয় যেমন

মরণেরও ভয় তেমনি, কারণ জীবনের পরে মৃত্যু আসিবেই। জীবন এবং মৃত্যুতে সম্বন্ধ নিত্য, একের পর অপর নিশ্চিত আসিবে। পুনর্জন্মে বিশ্বাসের মূল চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। আত্মা অমর মানিতেছি, সে বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতি-নিহিত। আত্মা অমর, কিন্তু শরীর ক্ষণভঙ্গুর, দেখিতে দেখিতে বিনষ্ট হয়। অতএব সেই অমরাত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর এক শরীরের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এরূপ বিশ্বাস সহজেই মনে উদিত হয়। বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই তাহার ফল বিচিত্র

হইবে। বিশ্বাসের বলে যাহা সাধিত হয়, আর কোনও বলে তাহা সাধিত হয় না। পুনর্জন্মে বিশ্বাস থাকাতে কখন কখন এরূপ বিশ্বাসও হয় যে, এই জন্মে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে এইরূপ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাতিস্মরের অনুরূপ শব্দ অন্য কোন ভাষায় নাই। কেহ বলে, পূর্ব্বজন্মে আমি রাজা ছিলাম, তৎপূর্ব্ব-জন্মে অশ্ব ছিলাম, তাহার পূর্ব্বজন্মে আমি বরাহ ছিলাম। এই কথা সে নিজে বিশ্বাস করে, এবং তাহার মুখে শুনিয়া

অপর লোকেও বিশ্বাস করে। প্রাচীন কালে অনেক লোকে এইরূপ বিশ্বাস করিত, এখনও অনেক লোকে এই-রূপ বিশ্বাস করে। যদি পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত মানুষে বলিতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতের কথা বলাও অসম্ভব নহে। এ জন্মে যে ভিক্ষা করিতেছে, পরজন্মে সে রাজত্ব করিবে, এ কথা বিশ্বাস করিতেও বড় বিলম্ব হয় না। অতীতের অন্ধকার ভেদ করিব, ভবিষ্যতের যবনিকা তুলিব, এ ইচ্ছা আমাদের মনে যেমন বলবতী, এমন আর কোনও অভিলাষ নহে।

৭

এই দুইটি মৌলিক কথা দৃঢ় করিয়া ধারণা করা চাই—আকাঙ্ক্ষা, বাসনার বল, এবং মরণের ভয়। মরিলে কি হয় জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা করে, মরিলে কি হয় কোনও মতে জানিতে পারি না, সেই জন্য মরিতে ভয় করে। জীবন সম্বন্ধে কিছুই কল্পনা করিতে হয় না, সমুদয় প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। মৃত্যুর সম্বন্ধে নানা রকম কল্পনা করি। মৃত্যুর পরে স্বর্গ নরক, প্রস্ফুটিতপারিজাতমন্দারশোভিত, অপ্সরোসেবিত, অনন্ত সুখের স্বর্গ,

জীবন ও মৃত্যু।

ঘোর আর্ত্তনাদপরিপূরিত অসীমযন্ত্রণাময় নরক। মহম্মদের স্বর্গে বিলাসের মাত্রা আরও অধিক, যীশুখৃষ্টের স্বর্গ শিশুর হাসিমুখ পূর্ণ। কেহ স্বর্গে তপস্যার আশ্রম দেখে, কেহ মৃগয়ার স্থান কল্পনা করে, কেহ মনে করে স্বর্গবাসিগণ জিতেন্দ্রিয, কেহ মনে করে বিলাসিতাই স্বর্গসুখ। স্বর্গ ঊর্দ্ধে, নরক পদতলে। কোটীনক্ষত্রধারী, চন্দ্রসূর্য্যের বিহারভূমি, দিগন্তপ্রসারিত ঐ যে নীল নভোমণ্ডল, উহার পশ্চাতে স্বর্গ ভিন্ন আর কি থাকিবে? আর পদতলে এই যে

জীবন ও মৃত্যু।

পৃথিবীর গর্ভ—অন্ধকার, উত্তপ্ত, ভীষণ, শ্বাসরোধকারী—ইহার তলে নরক ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে? স্বর্গ নরক আর কিছুই নহে, মনুষ্যকল্পনা-কল্পিত পৃথিবীর নামান্তর মাত্র। যাহাকে এখানে সুখ বলে, সেই সুখ স্বর্গ, যাহাকে এখানে দুঃখ বলে, সেই দুঃখ নরক। বিলাসের সুখ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সুখ, তপস্বীর সুখ, জিতেন্দ্রিয়ের সুখ, অগ্নি-দাহের যন্ত্রণা, বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা, তপ্তলৌহের দণ্ডাঘাত, সমুদায়ই পৃথি-বীতে আছে। যে স্বর্গ নরক আমরা

কল্পনা করিয়াছি, তাহা এই পৃথিবীর উপাদানেই নির্ম্মিত। এই পৃথিবীর সুখদুঃখই অধিক পরিমাণে কল্পনা করিয়া স্বর্গ নরক নির্ম্মিত হয়। মানুষের পক্ষে পূর্ব্বলোক, পরলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক, প্রেতলোক, সবই এই পৃথিবীর মত, সবই এই জীবনের প্রদীপশিখায় আলোকিত। বিশ্বের বাহিরে যাহা কিছু আজ পর্য্যন্ত কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেই বিশ্বের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে জীবনের বাহিরে কল্পনার গতি নাই।

৮

অমর অর্থে আমরা কি বুঝি? জন্ম হইয়া যে মনুষ্যের মৃত্যু হয় না, সেই অমর। যে ঋষিগণ অমরত্বের বরলাভ করিয়াছেন, প্রবাদ আছে তাঁহারা এখনও জীবিত আছেন। আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিনা সত্য, কিন্তু তাঁহারা এই লোকেই আছেন, হিমালয়ের দুর্গম প্রচ্ছন্ন প্রদেশে এখনও বাস করিতেছেন। তাঁহাদের অমরত্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি আমি বলি যে, হনুমান অথবা বিভীষণ, ব্যাস

অথবা কপিল, ইঁহারা কেহ জীবিত নাই, তাহা হইলে কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, তাঁহারা জীবিত আছেন। যে অর্থে তাঁহারা মরেন নাই, সে অর্থে সকলেই অমর, কারণ সকলেরই আত্মা অবিনাশী। বিভীষণ অমর, এ কথায় তাঁহার আত্মার অমরত্ব বুঝা যায় না, তাঁহার শরীরের অমরত্ব বুঝিতে হইবে। অথচ বিভীষণ যে জীবিত নাই, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। যদি এরূপ বলা যায় যে, বিভীষণ জীবিত আছেন, কিন্তু স্থূল চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে আমরা

দেখিতে পাইতেছি না, তাহা হইলেও তিনি অমর (যে অর্থে 'অমর' শব্দ এমন স্থলে ব্যবহৃত হয়) নহেন। জীবাত্মা মাত্রেই অমর। যেমন বিভীষণের মূর্ত্তি স্থূলচক্ষুর গোচর নহে, সেইরূপ কোন সাধারণ ব্যক্তির দেহ-মুক্ত আত্মা স্থূলচক্ষুর গোচর নহে। বিভীষণ যেমন অমর, তেমন সকলেই অমর, অথচ বিভীষণকে অমর বলিলে আমরা যাহা বুঝি, অপর কোন লোকের সম্বন্ধে সেই কথা বলিলে আমরা সেইরূপ বুঝিব না।

এ রকম অমরত্ব কেহ লাভ করিতে

পারে, এমন কথা অনেকে বলেন না। কিন্তু আর এক রকমের অমরত্ব আছে, সেইটা সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। সেই অর্থে অমর কথা সকলেই লেখে, সকলেই ব্যবহার করে। এই অর্থে মহাকবিগণ অমর, লোকশিক্ষকগণ অমর, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা অমর, উচ্চ বৈজ্ঞানিকেরা অমর। বেদপ্রণেতা ঋষিগণ, পৌরাণিক মুনিগণ, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, সক্রেটিস, প্লেটো, আলেক্জাণ্ডার, ইস্কাইলস, মুসা, যীশুখৃষ্ট,

সিজর, ডিমস্থিনিস, এরিষ্টটল, সিসিরো, দান্তে, নিউটন, মহম্মদ, নেপোলিয়ন, সেক্সপিয়র, মিল্টন, গেটে, ওয়াশিংটন প্রভৃতি অমর। এমন আরও অনেক নাম করা যায়। ইঁহাদের মধ্যে কেহই জীবিত নাই, অথচ ইঁহাদের নাম, ইঁহাদের কীর্ত্তি রহিয়াছে, সেই কারণে ইঁহারা অমর। অমরগণের তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হইতে চলিল, কেন না, মহাত্মাগণ সকল সময়েই জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে হয় ত পৃথিবীর কত অংশে কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সমসাময়িক

লোকেরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিতেছে না, পরে ইঁহারাই আবার অমর বলিয়া গণ্য হইবেন।

৯

এই স্থানে আবার জিজ্ঞাসা করি, অমর অর্থে আমরা কি বুঝি? মানুষ জন্ম না হইলে অমর হইতে পারে না, কারণ চিরজীবনের অর্থই অমরত্ব। মানবশ্রেষ্ঠ এবং সাধারণ লোকে প্রভেদ কি? বুদ্ধদেবও যেমন দেহত্যাগ করেন, একজন সামান্য মনুষ্যও সেইরূপ দেহত্যাগ করিবে, এ দুই জনে কিসের প্রভেদ? বুদ্ধের নাম

এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, কিন্তু সে সামান্য লোকের নাম কেহ জানে না। নাই বা জানিল, তাহাতেই বা কি? আত্মা ত উভয়েরই তুল্য অমর। অগ্নিতুল্য প্রতিভান্বিত শাক্য মুনির আত্মা যেমন অমর, এই মূর্খ লাঙ্গলবাহী কৃষকের আত্মাও তেমনি অমব। এ দুইয়ে প্রভেদ আছে। বুদ্ধদেবের মহাবাক্যের সহিত এবং মানবজাতিব সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তিনি যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ইহলোকে রহিয়াছে, তাঁহার আত্মা পূর্ণে মিশিয়াছে। মনুষ্যের আত্মা

যদি ব্রহ্মের অংশ বলিয়া মানি, ত আত্মার সহিত মৃত্যুর পরে ইহলোকের আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না। ব্রহ্মে আত্মা লীন হইলে অমরত্ব হয় না, কারণ অমরত্বের অর্থই পৃথক্ অস্তিত্ব। অমর শব্দের যে অর্থ আমরা জানি, তাহাতে ব্রহ্মে লীন হওয়াও বুঝাইবে না, যে হেতু অমরত্বের সহিত পার্থক্য ভাব বিজড়িত রহিয়াছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ সকলে স্বতন্ত্র, অথচ সকলে অমর। বুদ্ধ যে সকল বাক্য উচ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা ইহজীবনেই তাঁহার শিষ্যগণ শুনিয়াছিলেন। সেই

সকল অমূল্য বাক্য অদ্যাবধি জীবিত রহিয়াছে। এই সকল মহাত্মাগণ, যাঁহাদিগকে আমরা অমর বলি, ইহ-জীবনের গুরু, তাঁহাদের বাক্যবলে অসংখ্য জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের বীর্য্যবলে দেশের গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের অসাধারণ শক্তিরূপী শিখর হইতে জীবনের নির্ঝর অদ্যাপি প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহাদের জীবনে যে আলোক জ্বলিয়াছিল, মৃত্যুর পরে তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই, মৃত্যু সে প্রদীপে তৈল প্রদান করে, তাহাতে শিখা আরও উজ্জ্বল

হয়। পুরুষানুক্রমে মনুষ্যজাতি জন্মিতে মরিতে থাকে, তাঁহারা অনন্ত জীবনের ধ্বজা ধারণ করিয়া অটল-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহাদের মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হইয়াছিল, কালের অবরোধে তাহা রুদ্ধ হয় নাই, ভেরীগর্জ্জনের তুল্য অতীতের প্রান্তর ভেদ করিয়া আমাদেব শ্রবণে পশিতেছে। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ, তাঁহাদের অসংখ্য কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবার নহে, মানবজাতি তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখে, মহামূল্য ধন বলিয়া বিনষ্ট হইতে দেয় না। রামায়ণ

জীবন ও মৃত্যু।

মহাভারত আর থাকিবে না, বুদ্ধদেবের,যীশুখৃষ্টের অপূর্ব্ব শিক্ষা বিলুপ্ত হইবে, এমন মনে করিতে ইচ্ছা হয় না, এমন বিশ্বাস হয় না। এই জন্য বলি, যত দিন ইংরাজি ভাষা থাকিবে, তত দিন সেক্ষপীয়রের নাটকাবলী থাকিবে, যত দিন পৃথিবী রহিবে, তত দিন বুদ্ধদেবের, যীশুখৃষ্টের মহাবাক্য সকল লুপ্ত হইবে না।

যত দিন পৃথিবী রহিবে। সে কত দিন। যথার্থ বুঝিতে গেলে যখন চিরজীবী হও বলিয়া আমরা আশীর্ব্বাদ করি, তখন এই কথার যে অর্থ,

অমুক গ্রন্থের অথবা অমুক বাক্যেব কখন বিনাশ হইবে না, এ কথাবও সেই অর্থ। যাবৎ পৃথিবী বহিবে, তাবৎ রামায়ণ মহাভাবত বহিবে, এ কথাব অর্থ কি? বামাযণ মহাভারত ত্যাগ কবিযা, বিস্মৃতিব সাগবে বিস-র্জ্জিত করিযা, মানুষ কেমন কবিষা রহিবে, পৃথিবী কেমন কবিয়া চলিবে, সেটা আমাদেব ভাবিতে ইচ্ছা করে না। আমাদেব স্বভাবে এই বকম একটা দুর্ব্বলতা আছে। যত দিন বুদ্ধদেবের, যীশুখৃষ্টেব কীর্ত্তি বহিয়াছে, তত দিন কি আর রহিবে? আমরা

যদি বহিবে না ত কোথায় যাইবে, যদি তাঁহাদেব কীর্ত্তিই না বহিবে ত পৃথিবীতে বাকি বহিবে কি,কাহার বলে . মানুষ দাঁড়াইয়া আপনাব কাজ করিবে, কি ধবিয়া বিস্মৃতির অবিশ্রান্ত তবঙ্গভঙ্গ হইতে বক্ষা পাইবে ? মানুষ যে অমব, এই জগৎগুরুগণই ত তাহাব প্রমাণ, তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইলে মানুষেব আব বল হইবে কিসে ? কি ধবিয়া মানুষ এ দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে, কি সাহসে মৃত্যুর বিপক্ষে সদর্পে দাঁড়াইবে ?

১০

আর একটা কথা ভাবিতে হয়। যখন আমরা বলি, সক্রেটিস অমর এবং বায়রণও অমর, তখন কি আমাদের মনে দুই জনের অমরত্বের মধ্যে একটা উপমার ভাব উদয় হয় না? সক্রেটিস ও বায়রণ যে একাসনের অধিকারী, এমন কথা কেহ বলিবে না। সেই সঙ্গে অনেকে এমনও বলিবে না যে, এই দুই জনের নাম চিরকাল তুল্য স্মরণীয় রহিবে। এক কথায় সক্রেটিস যে শ্রেণীর অমর, বায়রণ সে শ্রেণীর অমর নহেন।

সক্রেটিস যদি এক লক্ষ বৎসর ইতি-হাসে পরিচিত থাকেন ত বায়রণ হয় ত তাহার অর্দ্ধেক কালও পরিচিত থাকিবেন না। অমরত্ব অর্থে দীর্ঘ কীর্ত্তি-স্মৃতি ভিন্ন আর কিছু নহে।

অমর-বাণী খুঁজিয়া দেখ। হিন্দু স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিবে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বেদসংহিতা। জেন্দ-অবস্থা এবং বাইবেলের পূর্ব্বভাগ বেদের পরবর্ত্তী। যদি প্রাচীন অমর বাক্য চাও ত ভারতবর্ষে অন্বেষণ কর, রত্নের খনি বহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। কিন্তু বেদ কত দিন হইতে আছে?

বেদের বয়স জিজ্ঞাসা করিলে যথার্থ বৈদিক বিরক্ত হইবেন। বেদ ত সত্য সনাতন, আদি গ্রন্থ, তাহার বয়স কে গণনা করিবে? আর্য্য-জাতি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সেই জন্য কথন ইতিহাসের নাম করে নাই। এত মহাকবি, মহাজ্ঞানী, মহাভক্ত এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস লিখিবার কেহ কখন চেষ্টা করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে ইতি-হাস কখন যথার্থ ইতিহাস হয় না, মানবজাতির ইতিহাস কখন প্রকৃত-রূপে লিখিত হয় না। ভারত-

বাসী যেমন ছিল, তেমনই থাকিলে বেদের বয়ঃক্রম জানিবার ঔৎসুক্য হইত না, ব্যাস বিভীষণ যে জীবিত আছেন, তাহাতেও কেহ সন্দেহ করিত না। ঘটনাক্রমে ইংরাজ তাহার ইতিহাস লইয়া আসিল—ইতিহাস অনেক সময় উপন্যাসের অন্যতর নাম। প্রত্নতত্ত্ববিৎ নামক এক অভিনব মহাত্মা ইংরাজের সঙ্গে আসিলেন, আসিয়াই বেদের ঠিকুচী কোষ্ঠী হাতড়াইতে লাগিলেন। বেদ যে স্বয়ম্ভু, অনাদি, এমন কথা ইংরাজী শিখিয়া কেহ কেমন করিয়া বলিবে!

বেদ অত্যন্ত প্রাচীন হইলেও চারি অথবা পাঁচ সহস্র বৎসর বয়স্ক মাত্র। যদি আমরা জোর করিয়া বলি, বেদের বয়স দশ সহস্র বৎসর, তাহা হইলেও বেদ অনাদি হয় না, এবং সে কথা অপ্রামাণ্যও বটে। যাঁহারা বলেন, বেদ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত অথবা গীত হইয়াছিল, তাঁহারা বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কাজেই আমরা নাচার হইয়াছি।

১১

চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদ—সরস্বতীতীরে ঊর্দ্ধমুখ মহাতপা ঋষি-

গণের সেই প্রাতর্বন্দনা, চতুর্দ্দিকে ঐশী শক্তির বিকাশ দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় এবং পুলকের উদ্রেক আমরা কল্পনা করি। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদ—তাহার পূর্ব্বে কি? মনুষ্যের উৎপত্তি কি চারি সহস্র বৎসর মাত্র হইয়াছে? যাঁহারা বেদ গান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কি পৃথিবীতে প্রথম মনুষ্য? তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব—এমন কথা বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সে বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে।

জীবন ও মৃত্যু।

চারি সহস্র বৎসরের সুদূর সীমা হইতে বেদবাক্য অদ্যাবধি ইহলোকে শ্রুত হইতেছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কি ছিল—মানবজাতি কি অবস্থায় ছিল—তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। কি গভীর নিস্তব্ধতা সেই, কি বিশাল প্রান্তর। জীবনের দীর্ঘ ছায়া তাহার নিকটে মিশাইয়া গিয়াছে, জীবনের পদচিহ্ন তাহার নিকটে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে, জীবনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি তাহার নিকটে গিয়া নীরব হইয়া গিয়াছে। মানুষ তখন কি করিত, কি ভাবিত, কাহার উপাসনা করিত।

তখন কি কোনও মহাবাক্য কথিত হয় নাই। মানুষ যে তখন ছিল, তাহার সাক্ষী কে? সাক্ষী কেবল চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী কেবল জীবন মৃত্যু, সাক্ষী কেবল সেই সর্ব্বকালদর্শী সর্ব্বযামী।

পৃথিবীর দীর্ঘ জীবনে, মনুষ্য জাতির দীর্ঘ জীবনে, চারি সহস্র বৎসর কতটুকু সময়? চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদ ছিল না, বেদের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কি মানুষ ছিল না? এই কি অমরত্ব, এই কি মৃত্যুকে পরাভব করা? চারি হাজার বৎসর—তাহার পূর্ব্বের কোন নিদর্শন আছে? কোনও

জীবন ও মৃত্যু।

মহাত্মার নাম আছে? কোনও মহা-বাক্য মানবলোকে প্রচলিত আছে? এই টুকু সময় লইয়াই এত গৌরব, এই কয় হাজার বৎসরের মধ্যেই বেদ ঈশ্বরবাক্য হইয়া গেল, মানুষ অমর হইয়া গেল? অতীতের যে বিশাল, প্রশান্ত, দুর্লক্ষ্য সমুদ্র, তাহার তীরে উপস্থিত হইয়াই আমরা থমকিয়া দাঁড়াই। চারি হাজার বৎসর সমুদ্রের তীর নহে ত কি। চারি সহস্র বৎ-সরের, দুই সহস্র বৎসরের, পাঁচশত বৎসরের কীর্ত্তি, আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষে সবই অমর। বেদের পূর্ব্বে কি মানুষ

ছিল না, বেদের পূর্ব্বে কি কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই, সমাজ সংগঠিত হয় নাই, মানুষের পথপ্রদর্শক কোনও দিব্য পুরুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন নাই? কি অহঙ্কারের কথা। চারি সহস্র বৎসর—এই কয়টি বৎসরের মধ্যে মানুষকে বাঁধিয়া রাখিব, ইহারই মধ্যে মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস বদ্ধ রহিবে? মিসরের অপূর্ব্ব পিরামিডের পূর্ব্বে কি কিছু ছিল না? পৃথিবী কত কাল, আর পৃথিবীতে মানুষ কত কাল? চারি সহস্র বৎসর হইতে মানুষ অমর, মানু-

জীবন ও মৃত্যু।

যের কীর্ত্তি অমর, তাহাব পূর্ব্বে অম-
বত্বের বর কেহ লাভ কবিতে পাবে
নাই ? হায়। কয় দিনেব অমব
আমরা।

যে দিকে চাহিয়া দেখি, মৃত্যুর
দীর্ঘ অন্ধকাব ছায়া দেখিতে পাই।
এত বড় বলবান কে। জীবন অবি-
শ্রাম মৃত্যুর রাজ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ
করিয়া তাহাব বাজ্য হরণ কবিবা লই-
বাব চেষ্টা কবিতেছে, বিফলপ্রযত্ন
হইয়া আবাব ফিবিয়া আসিতেছে।
চাবিদিকে মৃত্যুব প্রাচীর, সেই প্রাচী-
রের মধ্যে জীবন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

জীবন ও মৃত্যু।

কখন হুঙ্কার রবে কোনও তেজস্বী জীবন্ত পুরুষ সেই প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন, আবার দেখিতে দেখিতে ভগ্নাংশ নির্ম্মিত হইতেছে। মহাসমুদ্র মৃত্যু, তাহার বক্ষে জীবন-তরণী ভাসিতেছে, তরঙ্গে আরোহণ করিয়া দুলিতেছে, বাতাসের ভরে হেলিতেছে, অবশেষে সেই সমুদ্রগর্ভে ডুবিতেছে। ক্ষীণকণ্ঠে আমরা ডাকি, জীবনের জয়! সে শব্দ ডুবাইয়া, গম্ভীর নির্ঘোষে সর্ব্বকাল পরিপূরিত করিয়া, উত্তর আসে, মরণের জয়!

১২

জীবন শব্দ, মৃত্যু নিস্তব্ধতা, জীবন তটিনী, মৃত্যু সমুদ্র, জীবন দুর্ব্বল, মৃত্যু মহাবলবান, জীবন চঞ্চল, মৃত্যু স্থির, জীবন দাম্ভিক, মৃত্যু গম্ভীর, জীবন ক্ষুদ্র, মৃত্যু মহাকায়, জীবন মুহূর্ত্ত, মৃত্যু অনন্তকাল, জীবন সঙ্কীর্ণ, মৃত্যু প্রশস্ত, জীবন তরঙ্গময়, মৃত্যু নিস্তরঙ্গ; জীবন বায়ুতাড়িত, মৃত্যু নির্ব্বাত।

১৩

সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যজাতি মৃতদেহসৎকাবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিধি নিরূপণ করিয়া

দিয়াছেন। এতদিন পরে জগতের সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে যে, শবদাহই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াব শ্রেষ্ঠ উপায়। আত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, এই মৃণ্ময় দেহ যত শীঘ্র ভস্মাবশিষ্ট হয়, ততই ভাল। কিন্তু সমাধিস্থান দেখিলে যত কথা মনে আসে, শ্মশান দেখিলে তত কথা মনে আসে না। যত্ন রক্ষিত, কুসুমমাল্য-সজ্জিত গোরস্থান দেখিয়া মনে অনেক ভাবের উদয় হয় না। মানুষকে আরও দুর্ব্বল বোধ হয়—মনে হয়, যে স্থানে জীবনের কোন অধিকার নাই, সেখানেও মানুষের

দুর্ব্বল চিত্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। আত্মীয় যে ছিল, সে ত আর নাই, তাহার দেহ-ভস্ম মাটীতে মিশাইতেছে, সেই ভস্মের সহিত জীবনের সম্বন্ধ রাখিবার চেষ্টা করিয়া কি হইবে? আমি আর এক রকম সমাধিস্থলের কথা বলিতেছি। আমি দেখিয়াছি, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ সমাধিভবন ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ রক্ষক নাই, কেহ জানে না—কত কাল ধরিয়া সেখানে শবদেহ প্রোথিত হইতেছে। এখন আর সেখানে মৃতদেহ প্রোথিত করে না। মৃতের মধ্যেও নূতন পুরাতন

আছে। কেহ সে পথে চলে না, কেহ সে স্থান অধিকার করিতে যায় না, যেন সেই ভূমিখণ্ড মৃত্যুর রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে। জীবন সে স্থান হইতে সরিয়া গিয়া অন্যত্র তাহার বাসস্থান রচনা করিয়াছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি, কেবলই সমাধিভবন, ইট খসিয়া গিয়াছে, গাঁথনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোনও ব্যক্তি ধনী ছিল, তাহার গোরের উপর শ্বেতপ্রস্তর বহিয়াছে, খানিকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোনটা একেবারে সমভূমি হইয়া গিয়াছে, কোনটা অৰ্দ্ধ ভগ্ন, কোনটা

ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে কাঁটাগাছ দেখা দিয়াছে। সেখানে পাখীও বড় একটা আসে না। কিসের লোভে আসিবে?

এমন স্থানে দাঁড়াইয়া, অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া, কত কথা মনে আসে। যাহাদের দেহ সেইখানে পড়িয়া মাটীতে মিশাইতেছে, তাহারাই হয় ত কত সময় সেইখানে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিয়াছিল। ইহাদের ইতিহাস কে লিখিয়া রাখিয়াছে, কে বলিবে—জীবিতাবস্থায় ইহারা কে ছিল, কি ছিল। মহাপাতকীর

দেহাবশিষ্ট হয় ত মহাপুণ্যবানের দেহের সহিত মিশিতেছে। কত সুখ, কত ভোগ, কত শোক, কত সন্তাপ এইখানে আসিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। কোথায় জীবন—মৃত্যু যে সর্ব্বগ্রাসী। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কে কবে জিনিয়াছে। মরণের চিরকাল জয়।

১৪

মানুষ যে কেবল মৃত্যুকে ভয় করে, তাহা নয়। মরিতে ভয় না হই-লেও অনেক সংশয় হয়। মৃত্যু আমাদের মহত্ত্বের লাঘব করে, আমাদের মানের হানি করে। আমাদের জীব-

নের রাজপথে মরণ একটা প্রকাণ্ড বাধা, সে বাধা আমরা কখন দূর করিতে পারি না। অনন্ত জীবনকে মৃত্যু সান্ত করে, অখণ্ড অবিভাজ্য জীবনকে বিভক্ত করে। মৃত্যুর পরে কি, আমরা কিছু জানিতে পাই না কেন? যদি কিছু জানিবার না থাকে, তাহাই বা জানিতে পাই না কেন? আমরা এত বিঘ্ন বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, মৃত্যুর প্রাচীর কখন অতিক্রান্ত করিতে পারিলাম না কেন? প্রাচীরের বাহিরে কি আছে, কখন দেখিতে পাইলাম না কেন?

১৫

জীবনের সরল সূত্রে মৃত্যু গ্রন্থি বদ্ধ করে। আমাদের যাহা কিছু আছে, সকলেরই সীমা মৃত্যু। অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ যেমন, মৃত্যুর মধ্যে জীবন তেমন—যে টুকু সময় জলে সেই টুকু আলো, যে টুকু স্থান দীপরশ্মি অধিকার করে, সেই টুকু স্থানের অন্ধকার বিনষ্ট হয়, প্রদীপ নিভিলেই আবার সব অন্ধকার। যেমন নৌকা ডুবিলে তাহার উপর জলরাশি মিশিয়া আবার পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে, সেইরূপ জীবন ফুরাইলে

আবার মৃত্যুর স্রোত চারিদিক হইতে আসিয়া সেইখানে মেশে, আবার সব স্থির হয়, মৃত্যুর কল্লোলকোলাহলশূন্য গভীর স্রোতস্বিনী পূর্ব্বের মত বহিতে থাকে।

১৬

জীবনে যাহা কিছু আছে, তাহাতেই ব্যগ্রতার ভাব, চাঞ্চল্যের ভাব, ভয়ের ভাব দেখিতে পাই। সম্মুখে পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে একটা এমন কিছু দেখিতে পাই, যাহা দেখিতে ইচ্ছা করে না, যাহা দেখিলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজের মনোমত ভাব কল্পনা

করিতে ইচ্ছা করে। মানুষ নাকি অমর নয়, তাই কেবল বলিতে ইচ্ছা করে যে, মানুষ অমর, দীর্ঘজীবী বলিলে তৃপ্তি হয় না, মনের ভয় ঘুচে না। পরাধীন হইলেই যেমন স্বাধীনতার ইচ্ছা হয়, নশ্বর হইলেই সেইরূপ অবিনশ্বর হইবার ইচ্ছা হয়। অতীতের প্রতি যখন চাহিয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই যে, অতীতের যাহা কিছু নিদর্শন আছে, তাহা জীবনের অবশিষ্ট মাত্র। জীবন মৃত্যুর সহিত চিরকাল যুদ্ধ করিতেছে, মৃত্যু যাহা শীঘ্র অধিকৃত করিতে পারে না,

তাহাই দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। মৃত্যুকে যে একেবারে পরাভূত করিবে, কখন তাহার কবলে পতিত হইবে না, জীবনে এমন কিছু নাই।

১৭

অমরত্ব যে যথার্থ মানুষের প্রাপ্য নহে, এ কথা সকলেই চিরকাল বুঝিতে পারে। অমানুষ অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষেরা অমর হইতেন। অমর দেবতাগণের কল্পনা এইরূপে প্রথমে মানুষের মনে উদিত হয়। স্বর্গের ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ অমর, অথচ পৃথিবীর সঙ্গে চিরকালই

তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে। পৃথিবীর সঙ্গে ইন্দ্রের এত ঘনিষ্ঠতা যে, তিনি প্রতাপান্বিত সম্রাটদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, সময়ে সময়ে অসুরবধার্থ তাঁহাদের সাহায্যও প্রার্থনা করিতেন। রোম এবং গ্রীস ও প্রাচীন মিসর দেশেও এইরূপ দেবদেবীর কল্পনা ছিল। যুদ্ধে দেবগণ তাঁহাদের ভক্তবৃন্দের সহায়তা করিতেন, মানুষ ও দেবতা মিলিয়া উভয় পক্ষে সংগ্রাম হইত।

দেবতা ও মনুষ্যে এই রকম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কল্পনা করিলে আর একটা

উদ্দেশ্য সফল হয়। মানুষ জীবনের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ, দেবগণ সে গণ্ডীর বাহিরে। এ দুইয়ে সম্বন্ধ থাকিলে জীবন ও মৃত্যুতে বড় প্রভেদ থাকে না, মৃত্যুর অপর পার হইতে ইহ-জীবনে বার্ত্তা আসিতে থাকে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর, তাহা যেন ভাঙ্গিয়া যায়। এই মর-লোকের সঙ্গে অমরলোকের এমন সম্বন্ধ থাকিলে ভয় ভাবনার কারণ দূর হইয়া যায়। আধিব্যাধিশূন্য জন্ম-মৃত্যুভয়রহিত দেবতাগণ পৃথিবী-বাসীর সুখ দুঃখে, সৌহার্দ্দ বিবাদে উদা-

সীন নহেন ভাবিলেই অনেক সান্ত্বনা-
লাভ করা যায়। কেবল সান্ত্বনা নহে,
এরূপ মনে করিলে কিছু গৌরব ও হয়।
মানুষ যে শুধু অমর তাহা নহে, অমর-
গণের সঙ্গে আবার মানুষের আলাপ
পরিচয়ও আছে। পৃথিবীতে তপস্যা
করিতে বসিলে ইন্দ্রের ইন্দ্রাসন টলে,
সে কি সহজ কথা। ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া
লওয়াও মানুষের অসাধ্য নয়। ইন্দ্র-
পদলাভের আশায় কেহ তপস্যা করিলে
ইন্দ্র ভয়ে অস্থির হইতেন, তপস্বীর
তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে
অপ্সরা পাঠাইতেন।

১৮

সাধারণ লোকে ভূত প্রেতে ই বা বিশ্বাস করে কেন? মরিয়া ভূত হয়, এ কথার অর্থই বা কি? এ রকম যে কোনও বিশ্বাস দেখি, সকলের মূলেই সেই এক কারণ। মানুষ যাহা কিছু কল্পনা করে, সব এই পৃথিবী[illegible] লইয়া। যে ম[illegible]রয়া গেল, সে কোথ[illegible] গে[illegible] মা[illegible]র যে এত ভাল বাসিত, অ[illegible]কে কি একেবারে ছাড়িয়া গে[illegible]? বোধ হয় পৃথিবীর বাহিরে যায় নাই, যে বাড়ীতে ছিল, বোধ হয় সেই বাড়ীর মধ্যেই কোথাও ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে। তাহার সে শরীর ত আর নাই, এখন সে কি অশরীরী, না অন্য কোন আকার ধারণ করিয়াছে? নিরাকার আত্মা কি, আমরা বুঝিয়াই উঠিতে পারি না। সুতরাং কল্পনার সহায়তা খুঁজিতে হয়। তাহার পর ভূত দেখিতে আর বড় বিলম্ব হয় না। কেহ সাদা, কেহ পিঙ্গল বর্ণ, কেহ অন্য রংয়ের ভূত দেখে, কেহ বাষ্পাকৃতি, কেহ ধূমময় দেখে, কেহ অন্ধকারে দেখে, কেহ বা দিনের বেলাই দেখিয়া ফেলে।

ভূতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়াছে,

এমন অনেক শুনা গিয়াছে। কিন্তু ভূতের সঙ্গে কথা কহিয়াও কখন কিছু নূতন শিখিলাম না। সেই স্বর্গ নরক, সেই যন্ত্রণা, সেই সুখ। ভূত দেখিলে সাধারণ লোকে ভয় পায় কেন? যে আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সে মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আবার দেখিবার ইচ্ছা করে, মনে হয় যেন সে আমাদের একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই। তবু সেই প্রিয় জনের ভৌতিক মূর্ত্তি দেখিলে মনে এত ভয় হয় কেন? সে অজানিত বলিয়া। তাহাকে জানি, অথচ জানি না, তাই তাহাকে দেখিয়া

ভয় হয়, সে মৃত্যুর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আমাদের জীবনের আলোকের প্রতি কটাক্ষ করে, তাই ভয় হয়। তাহাকে ত আমরা চিনিতাম না, তাহার অবয়ব মাত্র চিনিতাম। তাহার সে অবয়ব নাই, তাই তাহাকে দেখিলে ভয় পাই। তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয় সত্য, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাহাকে যেমন দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়, অন্যরূপ দেখিলে ভয় হয়। জীবনের বাহিরে আমাদের কল্পনার গতি নাই, সেই জন্য মৃত্যু হইতেও জীবনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারি

না। যে গেল, সে যে একেবারেই গেল মনে করিতে কষ্ট হয়, মনে করা যায় না। স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া একেবারে চলিয়া গেল, আমাদের মন তাহাকে দেখিবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, তাহার কি কখন সেরূপ ব্যাকুলতা হয় না?

১৯

মৃত্যুকে আমরা কত ভয় করি, মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্তেই তাহা বেশ বুঝা যায়। যাহাকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি, সে মরিয়া গেলে তাহার

মৃতদেহ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না, ভয় হয়। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে—যখন প্রাণবায়ু তাহার দেহ পরিত্যাগ করে নাই—তাহার মুখের উপর মুখ দিয়া অশ্রুকম্পিত স্বরে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলাম। আর এক মুহূর্ত্ত পরেই সরিয়া দাঁড়াইলাম কেন? মৃতদেহ লইয়া এক ঘরে যদি একা নিশা-যাপন করিতে হয় ত ভয়ে অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়িতে হয়। অভ্যাসগুণে মৃতদেহের নিকটে থাকিতে আর ভয় হয় না, কিন্তু যাহা অভ্যাসসিদ্ধ, তাহা স্বাভাবিক নহে। শবাসনে বসিয়া

যোগাভ্যাস করাও ত অভ্যাসের ফল। কিন্তু এ সব স্বভাবকে পরাজয় করিবার জন্য। মৃতের নিকট জীবিতের থাকা স্বাভাবিক নিয়ম নহে। মৃতদেহ দেখিলে, মৃতদেহ নিকটে থাকিলে জীবিতের ভয় হইবে, ইহাই নিয়ম। বাড়ীতে যখন কেহ মরে, তখন দেখিতে পাইবে যে, আর সকলে এক স্থানে জড় হয়, সকলে যেন ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া পরস্পরের মুখ চাহিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করে। সম্মুখে কোন হিংস্র জন্তু দেখিলে মেষপাল যেমন ভয়ে ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়ায়,

মৃত্যুর আগমনে মনুষ্যের সেই অবস্থা হয়।

২০

জীবন বিস্মৃতি, মৃত্যু স্মৃতি। যত-ক্ষণ বাঁচিয়া আছি, ততক্ষণ মরণের ভাবনা ভাবিতে পারি না। ভাবিতে গেলে ভাবনা ফুরায় না, জীবনের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে সব ভাবনা ভুলিয়া যাই। মৃত্যু নামক যে একটা কিছু আছে, তাহাই মনে হয় না। ছোট ছোট সুখ দুঃখ লইয়া, বিবাদ বিসংবাদ স্নেহ প্রীতি লইয়া জীবন কাটাইতেছি, এমন সময়

জীবন ও মৃত্যু।

অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে মৃত্যু আসিয়া ধরে, যাহা কিছু লইয়া এত গোল করিতাম, সব পড়িয়া থাকে, আমরা বিদায় লইয়া প্রস্থান করি। কাল যাহাকে এক তিল ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না, আজ দেখি,—সে আমার কোলে প্রাণত্যাগ করিল। তখন মনে কি ভাব হয়, চক্ষে কেন জল আসে? শুধু কি প্রিয়জনবিয়োগে কাঁদি? না মনে মনে অভিমান হয়, জীবনের উপর রাগ হয়, অনাস্থা হয়? ভাবি, জীবনের যে এত কুহক, এমন মায়া, এমন যে সৌন্দর্য্য, পরিণামে ত এই!

জীবন ও মৃত্যু।

আমরা যাহা কিছু করি, জীবনের জন্যই কেন করি, মরণের জন্য কেন করি না? অবশেষে মরণের সম্মুখে ত জীবনকেই উৎসর্গ করিতে হয়। সেই সঙ্গে মৃত্যুর অনিশ্চিততায় মন বড় আকুল হয়। এই নিস্পন্দ শীতল দেহ, অর্দ্ধ দণ্ড পূর্ব্বে যে ইহার মুখের কথা শুনিয়াছিলাম। যে মুখের কথা শুনিয়াছিলাম, সে মুখ ত আমার সাক্ষাতে পড়িয়া রহিয়াছে, যে কথা কহিয়াছিল, সে কোথায় গেল? মৃত্যু কি? কিসের জন্ত জীবন, কি উদ্দেশ্যে আমরা জীবন ধারণ করি? এই রূপ সন্দেহ সংশয়,

জীবন ও মৃত্যু।

দুঃখ চিন্তা মনে উদয় হয়। জীবন অসার বোধ হয়, মৃত্যুর পরাক্রম দেখিয়া ভগোৎসাহ হইয়া পড়িতে হয়, জীবনের মিথ্যা প্রহেলিকায় আর বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করে না। মৃত্যুকে যখন এইরূপ সাক্ষাৎ দেখি, তখন মনের ভাব এই রকম হয়, কিন্তু এ রকম মনের ভাব অধিকক্ষণ থাকে না। থাকিবার যো নাই, থাকিলে মহা অনর্থ ঘটত। আমরা মরিব, অতএব জীবনের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, এ ধুয়া তুলিলে সংসার অচল হইয়া উঠে। মৃত্যুকে

জীবন ও মৃত্যু।

দিবা নিশি ঘরে রাখিয়া জীবনের কাজ চলে না। জীবনের রঙ্গস্থলের যে স্থানে মৃত্যু পদার্পণ করে, সে স্থান তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া, জীবন নিজের জন্য অন্য স্থান দেখে। যাহা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয় নাই, তাহাই জীবন। যতক্ষণ দিন ততক্ষণ জীবন, মৃত্যু আসিলেই রাত্রি আসিবে।

২১

পুনর্জন্মবাদ হইতে যে আত্মার অমরত্ব সিদ্ধ হয়, এমন বোধ হয় না। আত্মা নিত্য—এই মৌলিক বিশ্বাস হইতেই বহু জন্মে বিশ্বাস জন্মিয়া

থাকিবে। প্রাণী দেখিতেছি বহুবিধ, সকলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন রূপের, কিন্তু সকলের প্রাণ-প্রকৃতি একরূপ। মনুষ্য, গো, হস্তী, অশ্ব, ব্যাঘ্র, পক্ষী, পতঙ্গ নানাবিধ প্রাণী রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট, কিন্তু সকলেই প্রাণী, অর্থাৎ প্রাণ নামক যে বস্তু, তাহা সর্ব্ব জীবের মধ্যেই বর্ত্তমান। জীবমাত্রেরই সাধারণ স্বভাব আছে, কতক এমন নিয়ম আছে, যাহা সকল প্রাণীই পালন করে, এবং সকলেই যাহার অধীন। জীবন ও মৃত্যু সর্ব্বত্র সমান, সিংহাসনাধিপতিও যেমন

দেহত্যাগ করেন, তাঁহার রক্ষিত কুকুরও সেইরূপ দেহত্যাগ করে। আত্মা ত অমর—সম্রাটের আত্মা যেমন অমর, কুকুরের আত্মাও সেইরূপ অমর। এই দুই আত্মা কোথায় প্রয়াণ করিল? নিরাশ্রয় হইয়া আত্মা অধিষ্ঠান করিতে পারে না, পরম আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াও আত্মা মাত্রের সাধ্য নহে। অতএব বহুতর ক্ষেত্রে আত্মা দেহমুক্ত হইলে অন্য দেহে প্রবেশ করে, অন্য আকার ধারণ করে। উন্নতি অবনতি সর্ব্বত্রই নিয়ম, সে নিয়ম আত্মার সম্বন্ধেও প্রতিপালিত হইতে পারে। যে আত্মা

এ জন্মে গর্দ্দভ দেহ ধারণ করিয়াছে, পরজন্মে যে সে আবার সেই শরীর ধারণ করিয়া বস্ত্রভার বহন করিবে, এরূপ সম্ভব নহে। এ জন্মে যদি সে প্রভুর কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ত গর্দ্দভ জন্ম হইতে তাহার মুক্ত হইবারই সম্ভাবনা। আর যে পামর দুর্লভ মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াও পশুর অধম আচরণ করিতেছে, সে কি পরজন্মে আবার মানবকুল কলঙ্কিত করিবে? পূর্ব্বজন্ম পুনর্জন্ম এইরূপ পর্য্যায় ক্রমাগত চলিতেছে, চক্রের আবর্ত্তনের মত আত্মা ঘুরিতেছে,

জীবন ও মৃত্যু।

নিরবচ্ছিন্ন জন্ম মরণ ভোগ করিতেছে। নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে উৎকৃষ্ট প্রাণী, উৎকৃষ্ট প্রাণী হইতে নিকৃষ্ট প্রাণী, পূর্ব্ব এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্মের ফল-স্বরূপ ক্রমান্বয়ে আত্মা পরিভ্রমণ করিতে থাকে। আধুনিক ইয়োরোপীয় বিবর্ত্তবাদ এই জন্ম-পর্য্যায়ের নিয়ম, শারীর ধর্ম্মেও প্রমাণ করিতেছে। জীবের মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, কেবল যে কোনও জন্তুর আত্মা আমার শরীরে বিরাজ করিতেছে এমত নহে, সেই জন্তুর শোণিতও আমার ধমনীতে বহিতেছে।

আমি যে প্রাণীকে অত্যন্ত ঘৃণা করি, সেও আমা হইতে স্বতন্ত্র নহে, জীব-মাত্রেই কুটুম্ব, সর্ব্ব প্রাণী একই বিশাল পরিবারভুক্ত।

জন্মজন্মান্তরীণ এই ফলভোগ, অসংখ্য দেহ ধারণ, বহু প্রাণীর গর্ভে বাস, বহু জন্ম, বহুবার মৃত্যু, অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। জীবনের পরে মৃত্যু, মৃত্যুর পরে জীবন, এক শরীরের পরে অন্য শরীর, এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? অনিশ্চিত হইতে অনিশ্চিতে ভ্রমণ করিতে, অনন্ত কাল এই পৃথিবীতে বিঘূর্ণিত হইতে কে

সম্ভব হয়? জীবন মিথ্যা, মৃত্যু সত্য। জীবনের মোহপাশে অবিশ্রাম বদ্ধ হইতেছি, মৃত্যুর তথ্য কখনও জানিতে পারিলাম না। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করে না। জীবনমরণের ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে রক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করে। মুক্তির অধিক বাঞ্ছনীয় আর কিছু নাই। কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করিব, কি রূপে জীবন্মুক্ত হইব, এই চিন্তা মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, এই বাসনা অত্যন্ত বলবতী হয়। পুনর্জন্ম সকলেই বুঝিতে পারে। পুনর্জন্ম হইতে

অব্যাহতি লাভ করিবার সকলেরই ইচ্ছা হয়। বহু জন্মের পর হয় ত মানব দেহ ধারণ করিয়াছি, আবার মরিয়া পশুদেহ ধারণ করিব, এরূপ বিশ্বাস জন্মিলে মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। মরিয়া পুনর্ব্বার মানবদেহও ধারণ করিতে ইচ্ছা করে না। আবার এই সকল দুঃখ কষ্ট, এইরূপ দুস্পৃর-ণীয় কৌতূহল লইয়া কে জন্ম গ্রহণ করিতে চায়? আর যেন না জীবনের ভার বহন করিতে হয়, আর যেন জীবনের অন্ধকারে না পদস্খলন হয়, কেবল সেই কামনাই করি। অনি-

ত্যের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যেন নিত্যের ক্রোড়ে স্থান পাই, যেন কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে না নিক্ষিপ্ত হই, যেন কেন্দ্রস্থ হইয়া স্থির হইতে পারি। মুক্তি, মোক্ষ, লয়, নির্ব্বাণ যাহাই হউক, তাহাই যেন প্রাপ্ত হই, অনিশ্চিতকে দূরে রাখিয়া যেন নিশ্চিতের রাজ্যে উপনীত হই।

২২

এই জন্য তীর্থের মধ্যে বারাণসী তীর্থশ্রেষ্ঠ। যে তীর্থে মৃত্যু হইলে দেহপিঞ্জর হইতে আত্মা-পক্ষী চিরমুক্ত হইবে, সে তীর্থের তুল্য আর তীর্থ

জীবন ও মৃত্যু।

কোথায় ? যে ভীত, সে অভয় প্রার্থনা করে। জন্মমৃত্যুভীত জীব কাশীবাস করিলে অভয় প্রাপ্ত হয়। জন্মমরণ পেষণযন্ত্রবিশেষ, জীব তাহাতে নিরন্তর পিষ্ট হইতেছে। উপরের চক্র মৃত্যু, নীচের চক্র জীবন, এই দুই প্রস্তরের মধ্যে জীব ফিরিতেছে, পিষ্ট হইতেছে। এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা লাভ করিবার জন্য কাহার না আগ্রহ হয় ? এই ভয়ের উৎপত্তি হইলে পর, ইহার উপর বিশ্বাসের ভিত্তি সহজে স্থাপিত হইতে পারে। ধর্ম্মের বলে সেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ভয় সংক্রামক। পূর্ব্ব ও

পুনর্জ্জন্মের ভয় কাহারও পক্ষে বিবেচনার ফল, যুক্তির ফল, সাধারণের পক্ষে সহজ বিশ্বাস, লোকশ্রুতির ফল, ধর্ম্মের আচার্য্যদিগের শিক্ষার ফল। ভয় যেমন সাধারণ, নির্ভয় হইবার উপায়ও তেমনি সাধারণ। শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে কোনও কোনও পশু ও পক্ষী পলাইবার পথ না পাইয়া, বালুকায় অথবা ক্ষুদ্র ঝোপে মাথা লুকাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করে। তাহাদের সমুদয় শরীর বাহির হইয়া থাকে, এবং পশ্চাদ্ধাবিত শিকারী অথবা হিংস্র পশু তাহাদিগকে অনায়াসে বধ

করে। মূঢ়তাবশতঃ নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিলে অথবা মস্তক আবৃত করিলে ইহারা মনে করে যে, আর কেহ ইহা-দিগকে দেখিতে পাইবে না, শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। এইরূপ আত্ম-প্রতারণা অল্প অথবা অধিক মাত্রায় সর্ব্ব জীবের মধ্যে আছে। কিরূপে জীবনের ও মৃত্যুর চক্র হইতে এড়া-ইব—এইরূপ আত্মরক্ষার ভাব মনে উদিত হইলে, লোকে ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়। যে যাহা করিতে বলে, যেখানে লুকাইতে বলে, যেখানে পলাইতে বলে, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা

করে। নিজে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতে হয়। তীর্থমাহাত্ম্য মানুষ চিরকাল কীর্ত্তন করে। তীর্থযাত্রা আমাদের প্রকৃতিগত পবিত্র ধর্ম্ম। তীর্থ বিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিলে জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়, এ বিশ্বাস বিচিত্র কিসে ?

২৩

আকাশ যেমন নক্ষত্র, মৃত্যুতে সেইরূপ জীবন। আকাশের যেমন সীমা নাই, মৃত্যুর সেইরূপ সীমা নাই, আকাশ যেরূপ অন্ধকার, মৃত্যু সেইরূপ অন্ধকার—অর্থাৎ অজানিত, অদৃষ্ট।

জীবন ও মৃত্যু।

সর্ব্বব্যাপী আকাশ, মৃত্যু সর্ব্বব্যাপী। আকাশ যেমন নিজগর্ভে চন্দ্রসূর্য্য ধারণ করে, মৃত্যু সেইরূপ নিজগর্ভে জীব সকলকে ধারণ করে। নক্ষত্র যেমন জ্যোতির্ম্ময়, জীবন সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময়। মরিয়া মানুষ নক্ষত্র হয়, এ রকম বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক নহে। আলোকের সঙ্গে জীবনের এবং মৃত্যুর সঙ্গে অন্ধকারের সাদৃশ্য আমাদের মনে সহজেই আসে। আলোকে আমরা দেখিতে পাই, অন্ধকারে দেখিতে পাই না, জীবনকে আমরা জানি, মৃত্যুকে আমরা জানি না। রাত্রিকালে আমরা

জীবন ও মৃত্যু।

যখন আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন নক্ষত্রই দেখি, যেখানে শূন্য আকাশ, সেদিকে বড দৃষ্টিপাত করি না। সেইরূপ যখন আমরা মৃত্যুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন জীবনের দিকেই চাহিয়া দেখি, জীবনকেই মৃত্যুর প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করি। মৃত্যুর সমুদ্রে জীবন চিহ্নস্থান, যেখানে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই, সেখানে আমরা দিক্‌হারা হই। বেদের পূর্ব্বে মানব জীবনের কোনও চিহ্ন নাই, আমরাও আর কিছু জানিতে পারি না, জানিবার কোনও উপায় নাই। পথের কোনও চিহ্ন

নাই, কোনও সঙ্কেত নাই, পথ বলিয়া দিবার কেহ নাই। পৃথিবী যে পুরাতন, তাহার প্রমাণ বহুকালপ্রোথিত অস্থিকঙ্কাল—জীবনের অবশিষ্ট। যে স্থলে জীবনের চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, সেই স্থলে মৃত্যুর একাধিপত্য। মৃত্যু অতি বৃহৎ, আকাশতুল্য, জীবন সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ ধূমকেতুর মত।

২৪

যখন একান্ত চিত্তে মৃত্যুর পরাক্রম কল্পনা করি, জীবনের বিবিধবর্ণরঞ্জিত চিত্রপট হইতে যখন দৃষ্টি ফিরাইয়া

লইয়া মৃত্যুর অভিমুখে চাহিয়া দেখি, তখন মৃত্যুকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা করে, যুক্তকরে বলিতে ইচ্ছা করে, মহাবলবান তুমি, তোমার তুল্য বলবান কেহ নাই। তোমার মুখে তর্জ্জন গর্জ্জন নাই, নিস্তব্ধতাই তোমার বল। কেহ তোমাকে দেখিতে পায় না, কেহ তোমাকে চিনিতে পারে না, অথচ সকলে তোমারে জানে। তুমি যেখানে পদার্পণ কর, যেখানে তোমার ছায়া পতিত হয়, সে স্থান সকলেই চিনিতে পারে। সর্ব্বত্র তোমাব অপ্রতিহত গতি, সর্ব্বত্রই তোমার জয়। সর্ব্বস্বই

তোমার, যাহাকে তুমি গ্রহণ করিতে চাও, তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। যে শিশুকে কেহ মাতার ক্রোড়চ্যুত করিতে পারে না, তুমি সেই শিশুকে হরণ কর, মাতার ক্রোড় শূন্য কর। যে দম্পতীর মধ্যে কেহ কাহাকে ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, তুমি তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন কর। যে শোকে সন্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া চিত্ত শীতল করিবার ঠাঁই খুঁজিয়া পায় না, সে তোমার আশ্রয় কামনা করে। তোমার আগমন দেখিলে, তোমাকে স্মরণ করিলে,

জীবন ও মৃত্যু।

লোকে ভীত হয়, আবার তোমার অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি আছে, তাহাতে কেহ কেহ আকৃষ্ট হয়, জীবনকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উন্মত্তের মত তোমাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবমান হয়। সন্ধ্যার আকাশ যেমন জগৎকে অন্ধকারে আবৃত করে, তুমি সেইরূপ জীবনকে আবৃত কর। তোমাকে দেখিয়া শাক্যমুনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি মানুষকে বৈরাগ্যের শিক্ষা দাও। তোমার মুখ দেখিয়াই মানুষ ভাবিতে শিখে, তোমার ঘনান্ধকার ভেদ করিবার জন্যই ধ্যানের সৃষ্টি। তুমি

জীবন ও মৃত্যু।

সকলকে দেখা দাও অথচ কেহ তোমায় দেখিতে পায় না যে তোমায় দেখে সে একেবারে তোমার রাজ্যের প্রজা হয়। যেখানে বায়ুরও গতি নাই, সেখানে তুমি অবাধে যাইতে পার। আমরা তোমাকে জানিবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করি। তুমি ভিন্ন 'তোমাকে জানিবার অন্য উপায় নাই। যখন তোমাকে জানিব, তখন আর জীবনের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। কে তুমি, কি তুমি? কত যুগ ধরিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি, তুমি অদ্যাবধি কোনও

উত্তর দিলে না। কখনও কি কোনও উত্তর দিবে না?

২৫

মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হওয়া আমাদের ধর্ম্ম। সে কৌতূহল নিবৃত্তি হইবারও কোনও উপায় নাই। চিন্তাকুল হইয়া যখন মৃত্যুর ভাবনা ত্যাগ করি, সে সমুদ্রতল যখন স্পর্শ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসি, তখন সেই পরিক্লান্ত, নিরাশ দৃষ্টি জীবনের তৃণধান্যশস্যপূরিত ক্ষেত্রে পতিত হয়। মনে তখন কি ভাবের উদয় হয়? এই যে শিশুর হাস্যপূর্ণ জনসমাকীর্ণ

লোকালয়, ইহাও কি মৃত্যুর আবাস-স্থান নয়? জীবন কি? মৃত্যু ত আমাদের জ্ঞানাতীত, জীবনেব সম্বন্ধেই বা আমরা কি জানি? যাহা দেখিতেছি, তাহা কি সত্য? যাহা বুঝিতেছি, তাহা কি সত্য? আজ যেখানে প্রাসাদ দেখিতেছি, বিংশতি বৎসর পরে সেখানে কি প্রাসাদ দেখিতে পাইব? এ সব কি দেখিতেছি? কি আসিতেছে, কি যাইতেছে? জীবন কাহাকে বলি, ইহলোক কি, পরলোক কি? এ সব কিছুই ত সত্য বোধ হয় না! সবই

জীবন ও মৃত্যু।

অনিত্য, সবই মায়াময়। এই বিশ্বাস যেই স্থির হইল, হৃদয়ে মূলীভূত হইল, অমনি প্রতিশব্দ হইল, সব মায়া, সব প্রবঞ্চনা। জীবন,মৃত্যু,পৃথিবী,আকাশ, সূর্য্য নক্ষত্র সমুদয় অনিত্য, সব মায়ার খেলা। অসি যেমন কোষে লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ নিত্য এই অনিত্যের কোষে গুপ্ত রহিয়াছে, সত্য মায়ায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। সমুদ্রের তলে সমুদ্র আছে, বিশ্বাসের তলে বিশ্বাস আছে। কোথায় মৃত্যু, কোথায় জীবন—কেন ভাবিয়া আকুল হই-তেছ। যেমন জীবন, তেমনি মৃত্যু—

সব মিথ্যা। মায়া। মায়া। মায়া। মায়াজালে বদ্ধ তুমি, যে দিকে তুমি ফিরিতেছ, সেই দিকে তোমায় জড়াইতেছে, তোমায় ইন্দ্রজাল দেখাইতেছে। এই মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর— এই মুক্তিই যথার্থ মুক্তি, ইহা ব্যতীত অন্য মুক্তি নাই।

২৬

মৃত্যু কি জানিবার পূর্ব্বে, জীবন কি জানিবার চেষ্টা করা উচিত। জীব কিরূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহা সকলেই জানে। প্রাণীমাত্রেই শারীর

নিয়মাধীন হইয়া সন্তান উৎপাদন করে। কিন্তু যে নিয়মে প্রাণী উৎপন্ন হইতেছে, সেই নিয়মে কি বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে? আমাদের জীবন যেরূপ বিশ্বজীবন কি সেইরূপ? সন্তানোৎপত্তি কেবল কি পাশব ধর্ম্মের ফল, না তাহাতে আর কিছু মিশ্রিত আছে? শরীরে যে আত্মা আছে, তাহাও কি কেবল এই ধর্ম্ম পরিপালনের ফল? জীবোৎপাদন একটা বিশেষ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই সম্ভব হয়। সেই প্রবৃত্তির চরিতার্থতা আনন্দের কারণ—সে আনন্দ

জীবন ও মৃত্যু।

যেরূপই হউক, কেবল পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনার আনন্দ হউক, অথবা অতি নীচ প্রকারের আনন্দ হউক, আনন্দ বটে। অতএব ভ্রূণোৎপত্তি আনন্দসম্ভূত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই আনন্দ প্রাণীমাত্রেই সম্ভোগ করে। এই আনন্দ যে পবিত্র অথবা নিত্য নহে, এ কথা লক্ষ বার বুঝাইতে হয়। কিন্তু তাহাতেও অনেকে অনেক সময় বুঝে না, কারণ আমাদের স্বভাব এই যে, আমরা যে নিয়মের অধীন, সেই নিয়ম আমরা সর্ব্বত্র আরোপ করিতে চাই। সেই

জন্য আমরা বলি যে, প্রজাপতি যে নিয়মে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিয়মে আমরা অপত্য উৎপাদন করি। ক্রমে এই বিশ্বাস বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'আমি উৎপত্তিহেতু কন্দর্প।'* অর্থাৎ যে প্রবৃত্তি ফলবতী, তাহা অপবিত্র নহে, নিন্দনীয় নহে, বরং পবিত্র এবং ঈশ্বরানুমোদিত। যদি তাহাই হইল, তবে জগৎ কেনই বা এই নিয়মে সৃষ্ট না হইয়া থাকিবে? কিন্তু যাহারা এমত কহে, তাহাদিগকে

* ভগবদ্গীতা, ১০ম অধ্যায়।

জীবন ও মৃত্যু।

শ্রীকৃষ্ণ 'আসুরস্বভাব' বলিয়াছেন,—'তাহারা জগৎকে স্ত্রীপুরুষসম্ভূত ও কামজনিত কহে।' * তাহারা এমন কথা কেন বলে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। জগৎবাসী নাকি স্ত্রীপুরুষ-সম্ভূত ও কামজনিত, সেই জন্য সে সহজেই মনে করিতে পারে যে, জগৎ স্ত্রীপুরুষসম্ভূত ও কামজনিত। স্বর্গ নরকে বিশ্বাসের যে কারণ, এরূপ বিশ্বাসেরও সেই কারণ। কোনও নিয়ম, কোনও বিধি দেখিলে তাহাকে বিস্মৃত করা, আমাদের স্বভাব।

* ভগবদ্গীতা, ১৬শ অধ্যায়।

এই কথাটা আর একটু বুঝিয়া দেখা উচিত। জীব শরীর ধারণ পূর্ব্বক যত প্রকার আনন্দ উপভোগ করে, তাহার মধ্যে এই আনন্দ অত্যন্ত তীব্র। এই আনন্দ অপবিত্র, এ শিক্ষা আমরা সর্ব্বদাই পাইতেছি, এবং এই আনন্দ গোপনে উপভোগ্য,ইহাও এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। জিতেন্দ্রিয়ের প্রধান কর্ত্তব্য, এই এক ইন্দ্রিয় জয় করা। আর সকল প্রবৃত্তি সহজে ত্যাগ করা যায়, কেবল এই এক ইন্দ্রিয় জয় করা অত্যন্ত কঠিন। কোনও তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ করি-

বার জন্য দেবরাজ আর কিছু বা আর কাহাকেও পাঠাইতেন না, বিলাস-চতুরা ললামলাবণ্যময়ী বিদ্যাধরী প্রেরণ করিতেন। যে ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করিয়া সংসারের ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া পারত্রিক কুশলে একান্ত চিত্তে মনোনিবেশ করিত, যাহার কিছুতে মন টলিত না, তরুণীর বিভ্রমবিলোল কটাক্ষে তাহারও চিত্ত অস্থির হইত, বহু পরিশ্রমের তপস্যা ভঙ্গ হইত। এই আনন্দ মুহূর্ত্ত স্থায়ী মাত্র, অথচ এই আনন্দ প্রাপ্তির উপায় সম্মুখে আগত হইলে তাহা হইতে বিরত হওয়া

অত্যন্ত দুঃসাধ্য। মনুষ্যলোকে এই আনন্দ অত্যন্ত গোপনীয়, পশুদিগের মধ্যে গোপনীয় কিছুই নাই। এই আনন্দ ফলোপধায়ক, সন্তানের তরেই স্ত্রীপুরুষসংসর্গ আবশ্যক। পশুদিগের মধ্যে সেই নিয়ম আছে, মনুষ্য সে নিয়ম লঙ্ঘন করে। এই জন্য মানুষ এই আনন্দ গোপনে ভোগ করিতে চায়। যে প্রবৃত্তি উৎপত্তি হেতু, তাহাতে দোষের লেশমাত্র নাই, কিন্তু যে প্রবৃত্তি সে নিয়ম অতিক্রম করে, তাহা পাপজনক, সুতরাং গোপনীয়। যাহা গোপনীয়, তাহাই দূষণীয়।

২৭

প্রাণী যত প্রকার ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে অপত্যোৎপাদনের ক্ষমতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একে ত সেই প্রবৃত্তি আনন্দবিধায়ক, আবার সেই প্রবৃত্তি ফলবতী হইলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। এই শক্তি প্রজাপতির তুল্য। সন্তান হইলে মনে হয় এই জীব আমাদেরই সৃজিত, ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার বলে আমরা এই নূতন প্রাণী সৃজন করিলাম। ঈশ্বরের শক্তির অংশ যদি আমাদিগের না থাকিবে ত আমরা কেমন করিয়া স্বতন্ত্র

জীবন ও মৃত্যু।

প্রাণী উৎপাদন করিলাম? সৃজনে আনন্দ আছে, এই জন্য খৃষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে কথিত আছে যে ঈশ্বর সসাগরা পশুপক্ষীসমাকুল পৃথিবী সৃজন করিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজের সন্তান দেখিয়া মনুষ্য যেমন পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ পরিতৃপ্ত হইলেন। জীবের সৃষ্টিতে এবং জগতের সৃষ্টিতে কি প্রভেদ? জীব যদি চেতন বলিয়া জড়জগতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে জীবের উৎপত্তি জগতের উৎপত্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট কেন হইবে? যদি জগৎকে কামজনিত না বল, তবে

জীবন ও মৃত্যু।

জীবকে কেন কামজনিত বল ? কামজনিত হইলেই কি জীব জগতের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইল ?

জগৎ যে কামজনিত নহে, অথবা স্ত্রীপুরুষসম্ভূত নহে, এই শিক্ষা দেওয়া অনেক সময়ে আবশ্যক হয়, কারণ 'আসুবস্বভাব' লোকের সংখ্যা জগতে অধিক। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন রূপে বর্ণিত আছে। বাইবেলের অনুসারে জগৎ ঈশ্বরের আদেশে সৃষ্ট, আর কোনও প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয় নাই। ঈশ্বরের মুখ হইতে আদেশবাক্য নির্গত

হইল, অমনি জগৎ সৃষ্ট হইল, দিন রাত্রি হইল, আকাশ হইল, জল স্থল হইল, স্থাবর জঙ্গম হইল, সর্ব্বশেষে মনুষ্য সৃষ্ট হইল। কেন এরূপ হইল, এরূপ সৃষ্টি নৈসর্গিক কি না, সে কথার উত্তর নাই, উত্তরের আবশ্যকও নাই, কারণ, ঈশ্বরের বুদ্ধি অথবা ক্ষমতা মনুষ্য বুঝিতে পারে না। এই অলৌকিক সৃষ্টিবর্ণনা আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেন যে, জগৎ সহসা সৃষ্ট হয় নাই, প্রকৃতির নিয়মানুসারেই

ধীরে ধীরে সৃষ্ট হইয়াছে, কোনও অদ্ভুত উপায়ে শূন্য হইতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ পৃথিবী উদিত হয় নাই। ইহাতে যে গোঁড়া খৃষ্টীয়ানদিগের বিশ্বাস টলিয়াছে, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্বাস, বিজ্ঞান নহে।

যদি এ কথা আমরা মানি যে, জগৎ কামজনিত নহে, কিন্তু জীব কামজনিত, তাহা হইলে জগতের উৎপত্তিতে এবং জীবের উৎপত্তিতে প্রভেদ আছে, এ কথাও সহজে স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিক কেহই

মনে করে না যে, নরনারী মিলিয়া যেমন সন্তানোৎপাদন করে, সেইরূপে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। কথাটা এই যে, স্ত্রীপুরুষসম্ভূত মনুষ্যের জন্ম পবিত্র কি না, যদি পবিত্র, তাহা হইলে, সম্পূর্ণ পবিত্র কি না। জীবমাত্রেই যে কামজনিত, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু কামজনিত জন্ম কি অপবিত্র? তাহা হইলে জীবন অপবিত্র, কারণ জন্মের সহিত জীবনের আমরণ সম্বন্ধ থাকে। জীবের উৎপত্তি কামজনিত বলিয়া কি আত্মা আবিল হয়, না অন্যান্য নিয়ম যেরূপ,

জীবন ও মৃত্যু।

পবিত্র সন্তানোৎপাদনের নিয়মও সেই-রূপ পবিত্র অথবা অন্য নিয়ম অপেক্ষা অধিক পবিত্র? কিম্বা নিয়মের সহিত পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কোন সম্বন্ধ নাই, বিশ্ব যেমন নিয়মবলে সৃষ্ট হইয়াছে, জীবও তেমনি নিয়মবলে উৎপন্ন হইয়াছে?

২৮

জীবের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, এ কথা মানিয়া লইতে কেহ ইতস্ততঃ করে না। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যের সমকক্ষ কেহ নাই। তবে সৃষ্টির মধ্যে যে

জীবন ও মৃত্যু।

মনুষ্যের সমকক্ষ আর কেহ নাই, এ কথা তত সহজে বলা যায় না। যত কিছু সৃষ্ট পদার্থ আছে, তাহার মধ্যে কি মনুষ্য শ্রেষ্ঠ? এ কথা প্রামাণ্য হউক, বা না হউক, এ কথাও আমরা মানিয়া লইয়াছি, কারণ মনুষ্যদেহ অপেক্ষা আর পবিত্র মন্দির নাই, এ বিশ্বাস একরূপ মূলীভূত হইয়াছে। আত্মা অমর এবং ঈশ্বরাংশ, এই কথা বলিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকি না। মনুষ্য শরীরে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন, এ কথা জগতের সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। যে মন্দিরে, যে

শরীরে ঈশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠান করিতে পারেন, তদপেক্ষা পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ শরীর আর কোথায়? যে মনুষ্য দেহ ধারণ করে, সেই জগতে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করে। মানব জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন।

জীবনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াও আমরা জীবনের পূর্ণতা স্বীকার করিতে পারি না। মানুষ সুকৃত করে, আবার দুষ্কৃতও করে। সুকৃতের অপেক্ষা দুষ্কৃতই অধিক করে। আমাদের যে সকল প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অধোমুখী। মনে মনে অথবা মুখে যাহাকে দুষ্ক্রিয়া

বলি, অনেক সময় তাহাই কাজে করি। পুণ্যের অপেক্ষা পাপের আচরণ সহজ, যে প্রবৃত্তি অধোগামিনী, তাহার প্রণোদনাই সহজে আমাদিগকে বশীভূত করে। যে পুণ্যবান, তাহাকেও সর্ব্বদা পাপের আশঙ্কা করিতে হয়, যে ব্রতী, তাহাকে ব্রতভঙ্গের আশঙ্কা করিতে হয়, যে তপস্বী, তাহাকে তপস্যাভঙ্গের আশঙ্কা করিতে হয়। পশুভাব আমাদের স্বভাবে যেমন প্রবল, দেবভাব তেমন প্রবল নহে। ভাবিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের স্বভাব

উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। উৎকর্ষের সম্ভাবিতাই মানবপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা।

২৯

এইরূপ বিপরীত প্রবৃত্তি ও বিপরীত শক্তি চারি দিকে দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর বিশ্বাসীরা বলেন যে, পাপ এবং পুণ্য উভয় ঈশ্বরের অভীপ্সিত অথবা নিয়োজিত নহে, পুণ্যময় নিয়ম লঙ্ঘনের নামই পাপ। পাপের কারণ ঈশ্বর নহেন, পুণ্যের ব্যতিক্রম হইলেই পাপ হইল। এ কথা সত্য হউক অথবা মিথ্যা হউক, জগতে যে

জীবন ও মৃত্যু।

বিপরীত ব্যাপার, বিপরীত নিয়ম লক্ষিত হয় না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। জগৎ সর্ব্বত্র দ্বন্দ্বপ্রকৃতি, সেই দুই প্রকৃতি পরস্পরের বিরোধী—একে অপরকে নাশ করে। মৃত্যু জীবনের বিরোধী, অন্ধকার আলোকের বিরোধী। জগৎ এই দ্বন্দ্বনিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে। সুখ যেমন আছে, দুঃখ তেমনি আছে। ঐশ্বর্য্য যেমন আছে, দারিদ্র্য তেমনি আছে। গ্রহগণের গতি, পৃথিবীর ভ্রমণ, দুই বিপরীত শক্তিতে সাধিত হইতেছে, দুই শক্তি ঠিক পরস্পরের

বিরোধী, একটি আকর্ষণ করিতেছে, আর একটি নিক্ষেপ করিতেছে— একটি শক্তি কেন্দ্রানুগ, দ্বিতীয়টি কেন্দ্রাতিগ। উভয়ে উভয়কে বিনাশ করে না, বরং দুই মিলিয়া গ্রহগণের গতির আনুকূল্য করে। বিরোধই জগতের নিয়ম, বিরোধে বিনাশ হয় না, বৃদ্ধি হয়।

মনুষ্যের প্রকৃতিতে এই যে অনৈক্য এ কিরূপ বিরোধ? এই বিরোধে মনুষ্যজাতি চালিত হইতেছে সত্য, কিন্তু এই বিরোধকে আমরা অমঙ্গল-কর কেন মনে করি? যখন দেখি-

দেখেছি যে, বিরোধই জগতের নিয়ম, বিরোধেই বৃদ্ধি, তখন এই বিরোধ হইতে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা উচিত নহে। বাস্তবিক এ বিরোধকে কেহ অমঙ্গলের কারণ বিবেচনা করে না। সুপ্রবৃত্তি এবং কুপ্রবৃত্তিতে সংগ্রাম নিত্যই চলিতেছে। দুঃখ এই যে, মানুষ দুর্ব্বলস্বভাব, যে প্রবৃত্তির সহিত অধিক যুদ্ধ করিতে হয়, তাহারই বশ্যতা স্বীকার করে।

৩০

অতএব জীবনের সম্বন্ধে এ টুকু জানিতে পারিতেছি। জীবনের মূল—

অর্থাৎ জন্ম—সকল জীবেরই এক প্রকার। জীবের উৎপত্তি সর্ব্বত্রই একরূপ—আনন্দসম্ভূত। এই আনন্দ স্থূল আনন্দ—ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতা-জনিত আনন্দ—সকল প্রাণীই ইহা তুল্যরূপে উপভোগ করে। জীবন দ্বন্দ্বনিয়মের অধীন হইয়া, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, স্বাস্থ্য জরা প্রভৃতি ভোগ করিয়া পবিবর্দ্ধিত হয়। জীবনের পথ আবার দুইরূপ, এক পথ উন্নতির, আর এক পথ অবনতির। উন্নতির পথে বাধা বিঘ্ন বিস্তর, অবনতির পথ মুক্ত। কিন্তু এ টুকু জানিয়া আমা-

দের কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় না। জীবন সম্বন্ধে যাহা জানি না, তাহাই জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হই। যাহা দেখিতেছি, যাহা জানিতে পারিতেছি, তাহা ত কিছুই নহে। আমাদের জীবন ত নিতান্ত ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের মনে এত মহৎ ভাবের কেন উদয় হয়? অনন্তের জ্ঞান, অনন্তের আকাঙ্ক্ষা, অনন্তের উপাসনা আমাদের চিত্তমধ্যে এত প্রবল কেন? ঈশ-জ্ঞান, ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটা স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট জ্ঞান, সমুদ্রের জলপ্রবাহের ন্যায়

আমাদিগকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করে কেন? শরীরে ও আত্মায় প্রভেদ অতি সহজে অনুভব করা যায়। সর্ব্বদা মনে হয় যে, আমি অবিনাশী, কেবল আমার এই শরীর অনিত্য। বাহ্যজগতে যে এক অব্যয় সত্য দেখিতে পাই, যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নমস্কার করি, তাঁহার সহিত যেন আমাদের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রতীত হয়। জীবনের সূত্রপাত যে জন্মগ্রহণ কালে হইয়াছে,- এমন. মনে হয় না। এই জন্য জীবন অপূর্ণ, যতই জীবনের গভীরতায় প্রবেশ করি,

ততই যেন অন্ধকার বোধ হয়, জীবনের তল যেন সঙ্কুচিত হইয়া আরও নিম্নদেশে ডুবিয়া যায়। জানিতে গেলে আমরা ত আর কিছু জানিতে পারি না, কেবল আমাদের অজ্ঞতা ও জানিবার অক্ষমতায় ব্যাকুল হই, বিরক্ত হই। এই বিরক্তি বৈরাগ্যের মূল।

৩১

মায়াবাদের মূল মৃত্যুচিন্তা নহে। মৃত্যুর পরে মায়া কি কি, তাহা জানিবার যেমন উপায় নাই, মৃত্যুর সহিত তুলনা করিয়া জীবন সত্য অথবা মিথ্যা নিরূপণ করিবারও কোনও

উপায় নাই। প্রথম চিন্তা মৃত্যু-সম্বন্ধীয়। মরিয়া কি হয়, সেই গোড়ার ভাবনা। তাহার পর জীবনকে লইয়া একটু ভাবি। জীবনের সম্বন্ধে কিছু যে জানিবার আছে, কিছু যে ভাবিবার আছে, আদৌ সে কথা মনে হয় না। তাহার পর যখন ভাবিয়া দেখি যে, জীবনও আমাদের বোধাতীত, মৃত্যুর তুল্য কূট রহস্য,তখন নিতান্তই বিস্মিত হই। ক্রমে সংশয় হয়। জীবন ও মৃত্যু কি যথার্থ? দুই ত প্রহেলিকা, দুই ত মায়াময়, দুই ভ্রান্তির কারণ। সত্যের অনুসন্ধান জীবন ও মৃত্যুতে

করিলে চলিবে না, আরও কোথাও দেখিতে হইবে। এই মায়াপাশ মোচন করিয়া, এই রহস্য ভেদ করিয়া, আমরা শাশ্বত, অবিকৃত সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। বিরক্তি হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে সংশয়, সংশয় হইতে বিশ্বাস। যে ত্রিজগৎকে প্রপঞ্চ ও মায়াপরিপূর্ণ বিবেচনা করে, তাহার বিশ্বাসের মূল জীবনক্ষেত্রে রোপিত হয়।

৩২

মৃত্যু ও জীবন দুই দুর্ভেদ্য রহস্য, দুইয়ে কোন প্রভেদ নাই, এমন কথা

জীবন ও মৃত্যু।

সকল সময় বলা যায় না, সকলে বলিতে পারে না। জীবন ও মৃত্যুকে অভিন্ন বলা ন্যায়সঙ্গতও নহে। জীবন যতই কেন জ্ঞানাতীত হউক না, জীবনের রহস্যে এবং মৃত্যুর রহস্যে বিস্তর প্রভেদ। জীবনের রহস্যের অববোধ, চিন্তা এবং শিক্ষার অপেক্ষা করে, মৃত্যুর রহস্য জ্ঞান সহজ স্বভাবের গুণ। মরণ কি মানুষ মাত্রেই কোন না কোন সময় ভাবে, জীবন কি অনেকে হয় ত কখনই ভাবে না। মৃত্যু, মায়া, নিত্য, অনিত্য ইত্যাদি, জীবনের বলেই আমরা চিন্তা করি।

কেহ যেমন সমুদ্রতীরে বসিয়া নানা-বিষয়িণী চিন্তা করে, পর পারে কি আছে কল্পনা করে, সমুদ্রের গর্ভে কোন জীব বাস করে, কোথায় কোন অর্ণবযান তরঙ্গ ভিন্ন করিয়া চলিয়াছে, কোথায় প্রচণ্ড ঝটিকায় কোন জাহাজ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কোথায় কোন হতভাগ্য আবর্ত্তে ডুবিতেছে, কোথায় কোন বলবান পুরুষ ভয়কাতরা রমণীকে তরঙ্গের মুখ হইতে রক্ষা করিতেছে—এই সকল যেমন কল্পনা করে, কল্পনা করিতে করিতে যেমন আর সব ভুলিয়া যায়, সমুদ্র-তীরের নিশ্চিন্ত

আসন বিস্মৃত হইয়া নিজেকে বিপদ-গ্রস্ত পোতযাত্রী কল্পনা করে, সেইরূপ জীবনের তীরে বসিয়া আমরা কত কি কল্পনা করি। এই যে বিশ্বব্যাপিনী চিন্তা, জীবন হইতেই তাহার আরম্ভ, জীবনের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াই আমরা চারিদিকে চাহিয়া দেখি, যত উচ্চে আরোহণ করি, যত শিখরশৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী হই, ততই অধিক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। সকল সিদ্ধান্তের মূল জীবন। যদি জীবনে অবিশ্বাস হইল ত মৃত্যুতেও অবিশ্বাস। যদি ইহলোক সত্য হয়, তবেই পর-

লোক সত্য। যদি জীবন তঞ্চক মাত্র—মায়া—তাহা হইলে সমস্ত জগৎ মায়াময়। এই জন্য জীবন ও মৃত্যুকে কদাচ সমতুল্য বলিতে পারি না। জীবন যে প্রত্যক্ষ, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই, জীবন বিশ্বাসের বিশ্বাস, সংশয়ের সংশয়, মায়ার মায়া, অনিত্যের অনিত্য, নিত্যের নিত্য। যেঁ পরলোকে সুখের কামনা করে, সে ইহলোকেই তাহার উদ্যোগ করে, যে মুক্তি চায় সে এই স্থান হইতেই মুক্ত হইতে আরম্ভ করে, যে শান্তিপিপাসু, সে ইহজীবনেই শান্তিনির্ঝরের অন্বেষণ

করে। জ্ঞানেব, ভাণ্ডার, অজ্ঞানের কূপ, মৃত্যুব দ্বার, মুক্তির পথ এই জীবন। এই জন্ম জীবনে দৃঢ বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক। জীবনের সম্বন্ধে আমরা অধিক জানিতে পারি না বটে, কিন্তু জীবনের সম্বন্ধে অধিক জানিবার সম্ভাবনাও নাই, কারণ জীবন মৃত্যুর সহিত, অনন্তের সহিত, অগম্যের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে।

৩৩

চরাচরের নিয়মনিচয় এমনি সরল অথচ এমনি জটিল, এং বৈষম্যপূর্ণ যে, জগতের সম্বন্ধে অথবা মানুষের

সম্বন্ধে একটা কথা কহিলেই, একটা কোন নিয়ম দেখাইলেই আবার তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিতে হয়। দেখিতেছি যে আমাদের সমস্ত চিন্তা জীবনে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, অথচ জীবনের সেবায় আমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসমূহ নিযুক্ত হইলেই বিপদ! জীবনধারণ করা, এবং জীবনধারণের উপায় সংগ্রহ করা পাশব ধর্ম্ম, প্রাণীমাত্রেই তাহা করিয়া থাকে। জীবনের সেবা করিবার জন্ত যে যাহা করে, তাহাতে কোন উপকার হয় না, কোন কীর্ত্তি হয় না। এক জন সম্রাট

অথবা একজন পরাক্রান্ত সেনাপতি যে সকল ক্রিয়া করেন, তাহা শুদ্ধ জীবনের জন্য নহে। যশের আকাঙ্ক্ষা, দিগ্বিজয়েব আকাঙ্ক্ষা কেবল প্রাণ-ধাবণের জন্য নহে। পশুর স্বভাবে জীবনধারণ ব্যতীত অন্য চেষ্টা নাই। মনুষ্যের স্বভাবে অন্য প্রকার উত্তেজনা আছে। শারীরিক বৃত্তি সকল জয় করিবাব চেষ্টা কেবল মনুষ্যের মধ্যেই আছে। শরীরের প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইলেই তাহারা রিপু নামে অভিহিত হয়। এই শরীরকে দমন করাই যথার্থ জেতার কাজ।

ইন্দ্রিয়জেতাই যথার্থ বলবান। যে-তপস্যা করে, ক্ষুধাকে দমন করে, চঞ্চল চিত্তকে স্থির করে, সেই মানব-কুলে ধন্য। যে ভিক্ষুক, সেই যথার্থ ধনী, যে জীবনের সেবা করে না, সেই জীবনের যথার্থ উপকার করে। জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারেরা নানা কষ্টভোগ করিয়া, সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকল রচনা করেন। অনাহারে অথবা কারাগারে বৈজ্ঞানিকগণ নিগূঢ় বিজ্ঞানতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। নির্ব্বাসিত হইয়া দান্তে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কাব্য রচনা

করিলেন, দীর্ঘকারাবাসকালে তাসো তাঁহার সুবিখ্যাত কাব্য লিখিলেন, অন্নকষ্টে পড়িয়া কেপ্‌লর জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি করিলেন, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ বিরচিত করিলেন। শাক্যমুনি যদি পিতৃগৃহ—রাজগৃহ—না পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে কি কখন বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে প্রচলিত হইত? যীশুখৃষ্ট যদি আজীবন সূত্রধরের কাজ করিতেন, যদি তাঁহার মাথা রাখিবার ঠাঁই থাকিত, তাহা হইলে কি ভারতবর্ষে ইংরাজ কখন আসিত? মহম্মদ যদি

আরব্যদেশে ধর্ম্মানল না প্রজ্বলিত করিতেন, তাহা হইলে কি মোগল কখন দিল্লীশ্বর হইত?

৩৪

আকাশ যেমন এই বিশ্ব চরাচরকে বেষ্টন করিয়া আছে, জীবন সেইরূপ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। সকলের আদি জীবন, সকলের অন্ত জীবন। জীবনের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ,আমাদের যাহা কিছু আছে,যাহা কিছু হইবে,সমুদয় জীবনজনিত,জীবন-পরিমিত। জীবনকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। জীবনের

জীবন ও মৃত্যু।

বাহির হইতে কখন কিছু সংবাদ আসে নাই, কখন কিছু আসিবে না। স্বর্গ নরকের কল্পনা জীবনে, ভিন্ন লোকে বিশ্বাসের কারণ জীবন। সালোক্য, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ প্রভৃতি জীবনের বহির্ভূত নহে, জীবনেই এ সকলে বিশ্বাস আরম্ভ হয়। জীবন আমাদের সর্ব্বস্ব। কিন্তু জীবন অর্থে জীবনধারণ করা বুঝিলে হইবে না। জীবনধারণের চেষ্টায় জীবন পর্য্যবসিত হইলে সে জীবন বৃথা হয়। জীবন সান্ত, কিন্তু অনন্তের সহিত ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সকল রহস্তের অপেক্ষা

এই রহস্য বড় গভীর। জীবনের পূর্ব্বে কি, অথবা পরে কি, আমরা কোন কালে জানিতে পারিব না,কিন্তু চিরকালই জানিবার চেষ্টা করিব। বিশ্বাস নহিলে জীবনের তরু মূলবদ্ধ হয় না, বিশ্বাসের মূল জীবনের কোমল ভূমি ভেদ না করিলে বর্দ্ধিত হয় না। আমরা যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত কিছু নূতন অথবা পুরাতন তথা জানিতে পারিয়াছি, সকলই জীবন-বৃক্ষের কুসুমসদৃশ।

৩৫

যদি জগৎসুদ্ধ লোক স্বীকার

করে যে, জীবনের বহির্দেশ হইতে কখন কিছু আসে না, তাহা হইলে মানবজাতির উন্নতির পথ ঘুচিয়া যায়। জীবনের ক্ষুদ্র সীমায় আমাদের চিন্তা অথবা বিশ্বাস আবদ্ধ হইলেই আমাদের দ্রুত অবনতি হইবে। আমাদের বল অলক্ষিতে আইসে, বিশ্বাস যেন অন্য লোক হইতে আইসে, তিতিক্ষা, ক্ষমা, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণ অন্য কোন জীবন হইতে আইসে। জীবনরূপী সমুদ্র জীবনের ভেলায় চড়িয়া পার হওয়া যায় না, এই জন্য ধর্ম্ম, বিশ্বাস, ভাবুকতা

প্রভৃতি অন্য উপায়ের প্রয়োজন হয়।

এই জন্য জীবনকে জীবনের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। এই জন্য সর্ব্বদাই আমরা প্রতারিত হই। মনে হয়, যে, জীবনের বহির্দ্দেশ হইতেও জীবনের অন্তর্দ্দেশে কিছু আইসে। এক গ্রামেই জীবনের ইতিহাস সমাপ্ত হয় নাই, নগর হইতে নগরান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে সে ইতিহাস চলিয়া গিয়াছে। যেন এই জীবনের উপর দিয়া জীবনাতীতের ছায়া চলিয়া যাইতেছে। সেই ছায়ায় আমরা

জীবন ও মৃত্যু।

বিবিধ মূর্ত্তি দেখিতেছি, বিবিধ শিক্ষা লাভ করিতেছি।

যে বিশ্বাস করে যে, জীবনের পূর্ব্বে অথবা জীবনের পরে কিছু নাই, জীবন অনন্ত নহে, জীবাত্মা অমর নহে, সকলই ধ্বংসশীল, তাহার উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া যায়। মনে অনেক বল থাকিলে ইহজীবনের জন্যই জীবনের সদ্ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তেমন অমানুষী শক্তি লাভ করা যায় না। বিশ্বাসে বল, সংশয়ে বল নাই। সংশয়ের অপর নাম দুর্ব্বলতা।

৩৬

'মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তুগণকে ভক্ষণ করে না, এবং মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন।' * ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি সনৎসুজাত এই কথা কহিয়াছিলেন। মৃত্যুতে এবং ব্যাঘ্রে যে প্রভেদ, তাহা সহজ বুদ্ধিতেই উপলব্ধ হয়। ব্যাঘ্রের স্বরূপ আমরা জানি, মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন বলিয়াই মৃত্যু ভীষণ। ব্যাঘ্র কর্তৃক ভক্ষিত হইলে তবে জন্তুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্যাঘ্র

* উদ্যোগপর্ব্ব, সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়।

মৃত্যুর কারণ বলিয়াই ব্যাঘ্রকে দেখিয়া সকলে ভীত হয়। মৃত্যুর বিষয় যতই চিন্তা করি, ততই বিশ্বাস হয় যে, মৃত্যুর সম্বন্ধে অজ্ঞতাই আমাদের ভয়ের কারণ।

সনৎসুজাত পুনরায় বলিতেছেন, 'যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিষয়ানুরাগে অভিভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণময় ব্যাঘ্রের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।' বিষয়ানুরাগ হইতে নিবৃত্ত হওয়া সহজসাধ্য নহে, যিনি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে মৃত্যুভয়ও পরিত্যাগ করে। মৃত্যুভীতি পরি-

ত্যাগ করা তেমন কঠিন নয়। যাহার ধর্ম্মবল নাই, সেও অনেক সময়ে নির্ভীকচিত্তে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করে। মৃত্যুকে তৃণতুল্য জ্ঞান করা অভ্যাসের ফল। যাহার পরলোকে বিশ্বাস নাই, সেও নির্ভয়ে মরিতে পারে, যে অদৃষ্টবাদী, সেও নিশ্চিন্ত হইয়া মৃত্যুর মুখ অবলোকন করে। কিন্তু চিন্তা ত্যাগ করা যায় না, এই যে গভীর রহস্য, ইহা ভেদ করিবার অভিলাষ ত্যাগ করা যায় না। মৃত্যু কি ?—এই প্রশ্ন সর্ব্বক্ষণ মনোমধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকে।

৩৭

আলোকের সহিত অন্ধকারের যেরূপ সম্বন্ধ, জীবনের সহিত মৃত্যুর সেইরূপ সম্বন্ধ। মৃত্যুর ধ্যান করিতে করিতে জীবনের উপকূলে উপনীত হই, জীবনের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হই। চিন্তার অবধি নাই, কল্পনার সীমা নাই। আমরা জীবনের জালে বদ্ধ, জীবনের বর্ণে আমাদের নেত্র রঞ্জিত। জীবনকেই আমরা সর্ব্বত্র বিস্তৃত করি, জীবনকে সঙ্কীর্ণ করিলেই অনর্থ ঘটে। জগৎকে পরিচালিত করিবার, মানবজীবনকে

পবিত্র করিবার প্রধান উপায় বিশ্বাস —ধর্ম্মে বিশ্বাস, অনন্তে বিশ্বাস, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস। বিশ্বাস জীবনের উপর স্থাপিত হয় না। জীবন এত ক্ষুদ্র, এমন নশ্বর, এত দুর্ব্বল যে, কেবল জীবনের উপর ভরসা করিলে আমাদের বুকে বল হয় না, উৎসাহ হয় না।

৩৮

জীবন ও মৃত্যুর এই অনন্ত রহস্য অনন্ত কাল ধরিয়া মনুষ্যকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। যাহারা মনে করে, এই রহস্য ভেদ করিয়াছি, তাহারাই

বলবান, যাহারা নিত্য সংশয়ে আকুল হইয়া ইতস্ততঃ করে, তাহারাই মনুষ্য-কুলে দুর্ব্বল। বিশ্বাস স্থল, সংশয় জল। যে বিশ্বাসের উপর দাঁড়ায়, সে নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়ায়, যে সংশয়ের উপর দাঁড়ায়, তাহার অনুক্ষণ অন্ধকার অতলে ডুবিবার ভয় থাকে। সংশয়ের সমুদ্র সন্তরণ করিয়া, অবিশ্বাসের তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসের সৈকতে উঠিতে হয় এই জন্য আত্মজয়ের তুল্য জয় নাই। জগতে যাঁহারা মহাপুরুষ নামে খ্যাত হইয়াছেন, যাঁহারা অতি-শয় বলবান, সকলেই এইরূপ আত্ম-

জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে আপনার চিত্ত বশীভূত করিতে পারে না, যে আপনাকে জয় করিতে পারে না, সে দিগ্বিজয়ী হইবে কিরূপে? যে নিজে দাঁড়াইবার স্থান পায় নাই, সে পরকে আশ্রয় দিবে কোথা হইতে? অশ্বথবৃক্ষতলে শাক্যমুনির ধ্যান—আত্মজয়। আপনার হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক ধারণ করিয়া, প্রথম প্রভাশালী বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে ডাকিলেন। তাহারা সেই আলোক দেখিল। ক্রমে সেই সঞ্চিত আলোক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, দেশ হইতে দেশা-

স্তরে, জাতি হইতে জাত্যন্তরে সেই আলোক প্রবাহিত হইল, কোটি কোটি জীব সেই আলোকমার্গ অনুসরণ করিল। খৃষ্টদেবের পদানুসরণ করিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এই সকল মানবকুলকেশরী জীবিতাবস্থায় জীবনকে অতিক্রম করিতেন, বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন। জীবনের উন্নতিসাধন করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য, অথচ ইঁহারা সকলেই জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। জীবনে লোকে যাহা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে, তাহা

সকলই ইঁহারা পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু ইঁহাদিগকে আমরা কেহ পরিত্যাগ করিতে পারি না। ইঁহারাই আমাদিগের গুরু, ইঁহাদিগেরই পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আমরা সাধ্যমত জীবনপথে অগ্রসর হইতেছি। মানুষ অনবরত জীবনকে ক্ষুদ্র করে, সঙ্কীর্ণ করে, ইঁহারা আবার জীবনকে প্রশস্ত করেন। জীবন কিছুদিনে কূপসদৃশ হইয়া পড়ে, ইঁহারা আবার প্রসন্নসলিলা নদী লইয়া আসেন। ভগীরথের শঙ্খনাদ লক্ষ্য করিয়া, ললিত তরল গমনে, পুলকিত কণ্ঠে,

যেমন জাহ্নবী প্রবাহিতা হইয়াছিলেন, জীবন-জাহ্নবী সেইরূপ বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া এই সকল মহাত্মার কণ্ঠধ্বনি অনুসরণ করে।

৩৯

সর্ব্ব চিন্তার মূল মৃত্যু ও জীবন। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য জীবনের নিয়ম। মৃত্যুর পরেও আর কিছু আছে, এই বিশ্বাস যেমন স্বাভাবিক, পরলোকের সংস্থান করিবার ইচ্ছাও সেইরূপ স্বাভাবিক। জীবনে আমরা এমন কিছু দেখিতে পাই না যাহাতে বিশ্বাস হয় যে, জীবন সমাপ্ত হইলেই সব

ফুরায়। যতই আমরা দেখি, যতই আমরা শিখি, ততই বুঝিতে পারি যে, কিছুই ফুরায় না। চরাচরের সকল স্থানের নিয়ম পরিবর্ত্তন, সমাপ্তি কোন স্থানের নিয়ম নহে। জীবনের সমুদয় নিয়ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, না হয় সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন। জীবনের সুখদুঃখ অনেকটা আমাদের নিজের হাতে। জীবন যখন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নিয়মে নিয়মিত, তখন মৃত্যু যে সেইরূপ অভ্রান্ত সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন নিয়মে নিয়মিত নহে, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। জীবনে আমরা যে সকল সুখদুঃখ

ভোগ করি, তাহা কতক পরিমাণে আমাদেরই কার্য্যাকার্য্যের ফল। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমাদের ক্রিয়াসমস্ত বহুদূরগামী, যে বীজ আমরা আজ বপন করি, বহু-কাল পরে তাহার ফল সঞ্চয় করিতে হয়। যদি পরলোক থাকে, তাহা হইলে পরলোকেও ইহলোকের মত সুশৃঙ্খল নিয়মাবলী আছে। যে সমুদয় কার্য্য আমরা ইহলোকে করিতেছি, সেই সকল কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী। সেই অবশ্যম্ভাবী ফল যদি ইহজীবনে না ফলে ত পরজীবনে

ফলিবেই। নিয়ম মাত্রেই অলঙ্ঘ্য, কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলেই বিপদ ঘটিবে, এ কথা আমরা জানি। ইহ-জীবনে আচরিত কর্ম্মের ফল জীবনান্তরে ভোগ করিতে হইবে মনে করিলে, সাবধান হইয়া কর্ম্ম আচরণ করিতে হয়। আমরা যে সকল কার্য্যই পরলোকের বিষয় ভাবিয়া করি, এমত বলিতেছি না। কিন্তু পরলোকের ভয় অনিশ্চিত ভয়, এবং সেই ভয়ে আমরা অধিক ভীত হই। নিশ্চিত দণ্ডের অপেক্ষা অনিশ্চিত দণ্ডকে কে না বেশী ভয় করে?

৪০

বুদ্ধি বলে যাহা অনিশ্চিত, যাহা সপ্রমাণ করিতে পারি না তাহাতে বিশ্বাস করিব কেন? জীবনে পবিত্রতা হওয়া আবশ্যক, মনে বলের প্রয়োজন, কিন্তু সে জন্য পরলোকের কথা তুলিবার আবশ্যক কি? পরলোককে সাক্ষী মানিয়া কি হইবে? আমাদের জীবনকে লইয়াই কাজ। জীবনের পরে কি, মৃত্যুর পরে কি, তাহা আমরা কখন জানিতে পারি নাই, কখন জানিতে পারিবও না। অতএব অন্য লোকের দোহাই দিয়া,

আমরা কাহাকেও ধর্ম্মাচরণ করিতে বলি না। ধর্ম্ম কর, পুণ্য কর, সকলই ইহজীবনের তরে কর, ইহলোকের জন্য কর। পরলোকে সুখ ভোগ করিবে, পুণ্যফলে স্বর্গবাস হইবে, সে সব স্বপ্ন দূর করিয়া দাও। যাহা সম্ভব নহে, যাহার কোন প্রমাণ নাই, তাহাতে আমাদের কাজ নাহ। স্বর্গ নরকের কথা শুনিব না, পূর্ব্বলোক পরলোক মানিব না, তবুও সৎকর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করিব। পরোপকার জীবনের ব্রত করিব, আত্মদান অতি শ্রেষ্ঠ দান বিবেচনা

করিব। বালকের মত সহজে ভুলিব না, ভ্রমকে মনে স্থান দিব না। অবিবেচকের মত অসম্ভব কথায় বিচলিত হইব না।

এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিয়া কেহ কেহ অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করা সকলের সাধ্য নয়, সমাজ সূক্ষ্ম নিয়মে চালিত হয় না। মনুষ্য সমাজে যাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁহারা সাধারণের জন্য সূক্ষ্ম নিয়ম সৃষ্টি করেন নাই। এই কর্ম্ম কর, এই কর্ম্ম করিও না, এই আদেশবাক্য সমাজের ভিত্তিমূল

স্বরূপ। যে কথা সকলে বুঝিতে পারে, সেই কথাই সার কথা। মহাপুরুষেরা যে সকল মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। আদেশ জীবনের বন্ধন। যদি সকলেই পৃথক হইয়া দাঁড়ায়, সকলেই স্বেচ্ছামত আচরণ করে, কেহ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করে, তাহা হইলে সমাজ সংগঠন কখন সম্পন্ন হয় না, আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে সৌহার্দ্দ হয় না, জীবনধারণে সুখ থাকে না। এই যে কোটি কোটি নরনারী আসিতেছে যাইতেছে, ইহাদের মধ্যে বিশ্বাসের

বন্ধন রহিয়াছে। পরলোকে বিশ্বাস, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস, পাপ পুণ্যে বিশ্বাস আছে বলিয়াই সমাজ রহিয়াছে। জগতে নেতার সংখ্যা অত্যন্ত বিরল, অনুগামীদিগের সংখ্যা বিস্তর। সাধারণতঃ আদেশ পালন করা মনুষ্যের প্রধান গুণ। মহাপুরুষ মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মনুষ্যপ্রকৃতি সীমাবদ্ধ হইলেই নীচগামিনী হয়। জীবনের পূর্ব্বে কিছু নাই, পরে কিছু নাই, এ বিশ্বাস জন্মিলে জীবন মরুময় হইয়া উঠে। আমাদের স্বভাবে যত প্রকার বল আছে, তাহার মধ্যে আশা

জীবন ও মৃত্যু।

সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। যাহার কোন আশা নাই, তাহার সমান দুর্ব্বল কে? আশা না থাকিলে যে, সকলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা নহে। বিদ্যার বলে অথবা বুদ্ধির বলে আশা ত্যাগ করিয়াও কেহ কেহ দুর্ব্বলচিত্ত হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসীর বল যতই অধিক হউক, বিশ্বাসীর বল তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক। দুই ব্যক্তি সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে, এক জনের বিশ্বাস সন্তরণ করিয়া পার হইয়া তীরে উঠিবে, সেখানে লোকালয় আছে, আশ্রয় স্থান আছে, দ্বিতীয়

ব্যক্তি স্থির করিয়াছে যে, সমুদ্রের অন্ত নাই, পার নাই, তীর নাই। সন্তরণ করিয়া সে যতদূর যাইতে পারে যাইবে, কিন্তু অবশেষে ডুবিতে হইবেই। এ দুই ব্যক্তির অবস্থায় যেমন প্রভেদ, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর অবস্থায় তেমনি প্রভেদ। যদি জীবনের পরে কিছুই না থাকে, তবে এত ভাবিয়া মরি কেন? কেনই বা ইহলোক পরলোকের চিন্তা করি? আশাশূন্য বল কঠোর, নীরস, আশাপূর্ণ বল কোমল, সরস। যাহার বিরহে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে,

তাহাকে আবার দেখিতে পাইব, এ সান্ত্বনায় কত সুখ। জীবনের সঙ্গেই যে সব ফুরাইবে না, এ চিন্তায় কত আশা বাড়ে। যে আমার প্রাণতুল্য, তাহাকে আর দেখিতে পাইব না, মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই, এ কথা মনে হইলে জীবনের প্রতি অণুমাত্র অনুরাগ থাকে না। জীবন যে এত ক্ষুদ্র, তাহা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না, আত্মা যে মৃত্যুর অধীন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই জন্য কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, 'আমি বরং নরকে

বাস করিতে সম্মত আছি, তথাপি ধ্বংস হইতে সম্মত নহি।'

৪১

কিন্তু বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সত্যে বিশ্বাস করিতে হইবে, মিথ্যায় বিশ্বাস করিলে চলিবে না। ধর্ম্ম-বল, আত্মা বল, স্বর্গ নরক বল, সত্যের তুল্য কিছুই নাহে, 'সম্যক্ অধীত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয় একমাত্র সত্যের তুলা।'* সত্যকে ত্যাগ করিয়া তাহার বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করা

* বনপর্ব্ব, নলোপাখ্যান পঞ্চাধ্যায়।

যায় না। ইহলোকেব পর অন্যলোক আছে, এরূপ বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা হইলেই হয না, এরূপ বিশ্বাসের কারণ আবশ্যক। যদি এ বিশ্বাস অকা-বণ হয়, তবে ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি বুঝি যে, এ বিশ্বাস সত্য নহে, ইহাব মূলে সত্য নাই, তাহা হইলে ইহা পরিত্যাগ করিতেই হইবে, নহিলে সত্যের অবমাননা হয়। এই জীবনের পবে অন্য জীবন আছে, এরূপ বিশ্বাস আমবা কেন কবি? এ বিশ্বাস আমাদের প্রকৃতিনিহিত ও আমাদের আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী।

কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, আমাদের অনেক স্বাভাবিক বিশ্বাস মিথ্যা। এ বিশ্বাসও মিথ্যা, অতএব এ বিশ্বাসও পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আর এক কথা। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস না করিলে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে দোষারোপ হয় কেন? আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ নিত্য মনে করি, তাহা যে অনিত্য নহে, আমরা কেমন করিয়া জানিলাম? আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিবেচনা করি যে, ঈশ্বরের যে

অনন্ত অপরিসীম শক্তি, তিনি সেই শক্তির অংশ দ্বারা আমাদের আত্মা সৃজন করেন। এ বিশ্বাস শুধু কি কাল্পনিক নহে? ঈশ্বরের সৃষ্টির আমরা কি জানি? তিনি আমাদিগকে অমর সৃজন করিয়াছেন, ইহা আমরা কেমন করিয়া জানিলাম? যদি শরীর পতনের সহিত আমরা একেবারে ধ্বংস হই, তাহা হইলে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতায় কলঙ্ক স্পর্শ করিবে কেন? ইহলোক আছে, এইমাত্র আমরা জানি। পূর্ব্বলোক অথবা পরলোক সম্বন্ধে আমরা কিছু

জানি না, স্বর্গ নরকের যাহা জানি, তাহা মনুষ্যের কল্পনাপ্রসূত উপন্যাস মাত্র। আমাদের আত্মা যদি অমর না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে দোষ দিবার আমাদের অধিকার কি? তাঁহার ক্ষমতার আমরা কি জানি? ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলেও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আত্মা নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থই নাই। আমাদের অল্প বুদ্ধিতে বোধ হয় বটে যে, শরীর ও আত্মায় প্রভেদ আছে, কিন্তু আমাদের কয়টা অনুমান সত্য হয়? মনুষ্য শরীর

আশ্চর্য্য যন্ত্র, সে যন্ত্রের কৌশল যতই পরীক্ষা করা যায়, ততই বিস্মিত হইতে হয়। আত্মা নামক শক্তি যে সেই বিচিত্র যন্ত্রের প্রক্রিয়া নহে, এ কথাই বা আমরা কেমন করিয়া বলিতে পারি ? যতই চিন্তা করা যায়, ততই দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মে যে,অমরত্বে বিশ্বাস অমূলক, স্বর্গ নরক কল্পনা মাত্র, পূর্ব্বলোক পরলোক কোথাও নাই। এই নশ্বর শরীরের সঙ্গেই যে সব ফুরায় না, এরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। আত্মপ্রতারণার সমান মূর্খতা

আর নাই। আমরা স্বেচ্ছাকৃত ভ্রমে পতিত হইব না, চক্ষু থাকিতে চক্ষু মুদিত করিয়া অন্ধ হইব না। জীবন সমাপ্ত হইলে যে আর কিছু আছে, তাহার তিলমাত্র প্রমাণ নাই, অতএব পরলোকে অথবা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

৪২

যখন এই রকম নানা কথা শুনি, তখন মনে হয় যে, মানুষের বুদ্ধি অত্যন্ত তর্ককুশল, কিন্তু সে কৌশল অনেক সময় সুব্যবহৃত হয়

না। পূর্ব্বলোক পরলোকের অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব কি বিচারে স্থিরীকৃত হয়? প্রত্যেক মনুষ্য নিজের বুদ্ধি অনুসারে আস্তিক অথবা নাস্তিক হয়। আমি যদি পরলোক বিশ্বাস না করি, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস না করি ত সে অবিশ্বাসের অবশ্য কারণ আছে। আমি নিজে বিচার না করিয়া বিশ্বাস পরিত্যাগ করি নাই কিন্তু আমি যে বিচার করিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস টলিয়াছে বলিয়া যে, আর এক জনের বিশ্বাস টলিবে, এরূপ মনে করা ভ্রম। পরলোক, আত্মার

অমরত্ব ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভবে না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহিলে যুক্তি অকাট্য হয় না। এক জন যদি বলে পরলোক আছে, আর এক জন বলে পরলোক নাই, তাহা হইলে এই দুই জনের মধ্যে কেহ কাহাকেও ভ্রান্ত প্রমাণ করিতে পারে না। পৃথিবী গোল কি সমতল, এই প্রশ্ন লইয়া যদি দুই জনে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, এ বিবাদ মিটিবার সম্ভাবনা আছে, কারণ পৃথিবী যে গোল তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দেওয়া

যাইতে পারে। যে প্রমাণ প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি-মাত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বলোক পরলোক সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রমাণ কিছুই নাই—পরলোক আছে কি নাই, কোন দিকেই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, পাই-বার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যের ভাষা, মনুষ্যের কল্পনা সমস্তই ইহজীবনসম্বন্ধীয়। মনুষ্যের বুদ্ধি, তর্কসূক্ষ্মতা, বিচারশক্তি, ব্যবচ্ছেদ-শক্তি, প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, সকলের অবধি জীবন। কেবল

বিশ্বাসের কোন অবধি নাই। বিশ্বাসের এমনি বল যে, বুদ্ধি, বিচার কিছুই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। স্বর্গে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সে হাস্যমুখে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে। কারণ, স্বর্গলাভের তাহার দৃঢ় আশা আছে। সে সময় যদি সে বিচার করিতে বসে, স্বর্গ আছে কি না, তাহা হইলে দাহ যন্ত্রণা শতগুণ বৃদ্ধি হয়। সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করিলে সেই মুহূর্ত্তে স্বর্গলাভ হয়, এমন বিশ্বাস না থাকিলে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় বোধ হয় প্রাণদানে কিছু সঙ্কুচিত হইত। এ

সকল বিশ্বাস তর্ক দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। বিচার করিয়া অবিশ্বাস হয়, বিশ্বাসের জন্য বিচারের প্রয়োজন নাই। কে ভ্রান্ত কে অভ্রান্ত, তাহার বিচার কোন মতেই হইতে পারে না, কারণ এনন বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৪৩

মানবের এই এক আশ্চর্য্য স্বভাব, যে, যাহা অপ্রত্যক্ষ, অতীন্দ্রিয়, বোধাতীত, সেই বিষয়ের জল্পনা অত্যন্ত প্রিয় বোধ হয়। ঈশ্বরেব অস্তিত্ব, পূর্ব্ব ও পরলোকের অস্তিত্ব, আত্মার অম-

রত্ব, এই সকল অতীন্দ্রিয় বিষয়ের বিচারে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। ঈশ্বর সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ, পরলোক প্রকৃত অথবা কল্পিত, আত্মা অবিনশ্বর অথবা ধ্বংসশীল, এ বিবাদ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। এমন বিতণ্ডা মিটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। যে বিষয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ পাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, সে বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রমাণ একেবারেই নাই। এই জন্য বিশ্বাসের এত আবশ্যক। কোন ব্যক্তি বিশ্বাসে ভর করিয়া যখন বলে, সে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করি-

য়াছে, অথবা ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার স্বাভাবিক আগ্রহ পরিতৃপ্ত হইয়াছে। কোন ধর্ম্মের নূতন প্রাদুর্ভাব হইলে যদি কেহ বলে যে, ধর্ম্ম স্পর্শ করিবার, হস্তগত করিবার সামগ্রী হইয়াছে, তাহা হইলে সকলে বলিবে, সেই লোকের উত্তম ধর্ম্মজ্ঞান হইয়াছে। অসাধ্য সাধন করার অভিলাষ মানুষের মনে বড় প্রবল। ধর্ম্ম ধরিবার ছুঁইবার সামগ্রী নয়, তথাপি তাহাকে ধরিবার অত্যন্ত ইচ্ছা করে, ঈশ্বরকে দেখা যায় না বলিয়াই

তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা এত ব্যাকুল হই। স্বভাবতঃ আমরা অবিশ্বাসী, কোন কথাই সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। দ্বন্দ্ব-প্রকৃতি বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস আছে, অবিশ্বাসের অপেক্ষা বিশ্বাস বলবান.কখন কখন আমাদের অন্যান্য প্রবৃত্তি বিশ্বাসের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বাসের মত প্রতীয়মান হয়। পর-লোক আছে, এ বিশ্বাস থাকিলেও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা করে। এই জন্য ভূত প্রেতের কল্পনা। বিশ্বাস বলিতেছে, ঈশ্বর আছেন,

মানুষের স্বভাব বলে, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-গোচব কব। প্রহ্লাদরূপী বিশ্বাস বলে, সর্ব্বত্রব্যাপী বিশ্বকারণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, হিরণ্যকশিপুরূপী স্বভাব বলে, তবে এই স্তম্ভ ভেদ করিয়া তাঁহাকে আমি দেখি। বিশ্বাস প্রমাণের অপেক্ষা করে না, মানুষের স্বভাব প্রমাণের জন্য লালায়িত।

৪৪

মৃত্যুর পরে কি, তাহা তর্কের বিষয় নহে, বিশ্বাসের বিষয়। যাহা জগতের বাহিরে, তাহার প্রমাণ জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু

অবোধ মানুষ তাহাই খুজিয়া বেড়ায়। যদি সে সকল আশা চরণতলে দলিত করিতে না পারে, যদি জীবনকেই আশা ভরসার সীমা স্থির করিতে না পারে, তাহা হইলে সে শূন্য পরলোক লইয়া ইহলোকে থাকিতে পারে না। পরলোকে স্বর্গ নরকের সৃষ্টি করে, নন্দনকাননে মন্দার পারিজাত রোপণ করে, স্বর্গে মন্দাকিনী প্রবাহিত করে, শিশুর আনন্দলহরী তরঙ্গিত করে। বিশ্বাসের সঙ্গে স্বভাবের যোগ হয়, বিশ্বাস যেখানে দাঁড়াইবার স্থান দেখে, স্বভাব সেখানে পর্য্যঙ্কের অন্বেষণ

করে। বিশ্বাস মনুষ্যকে অত্যন্ত বলবান করে, কিন্তু বিশ্বাসও আমাদের প্রকৃতির অন্তর্গত, এই জন্য অন্যান্য প্রবৃত্তি অপেক্ষা বিশ্বাস অগ্রগামী হইলেও মনুষ্যপ্রকৃতিকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না।

পাছে জীবন মরণের মধ্যে কোন বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হয়, পাছে অনন্ত জীবন বহু খণ্ড হয়, এই ভয়ে অমুরত্বের কল্পনা। এই জন্য সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ত্রিকালদর্শী নামে অভিহিত হইতেন। যে ত্রিকাল দেখিতে পারে, তাহার অদর্শনীয় আর কি

বহিল? এই কালের প্রগাঢ় অন্ধকারে আমবা কত ভীত হই, কত বিস্মিত হই। এত আমাদের বল, এত আমাদের বীর্য্য, এত আমাদের চতুরতা—কালের মুখে ত কিছুই মুহূর্ত্ত মাত্র টিকিতে পাবে না। কালেব মত মৃত্যুর দ্বিতীয় সহায় নাই। কত সময় আমাদের মনে হয়, মৃত্যু ও কাল দুই অভিন্ন পদাথ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কালের গতি আমরা নিরূপণ করিতে পারি, মৃত্যুর সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারি না। অতীত, আগত, অনাগত কালের তিন মূর্ত্তি

জীবন ও মৃত্যু।

দেখিতেছি, মৃত্যুর কোন মূর্ত্তি দেখিলাম না। মানুষ মরিলে তাহার দেহের যে বিকার হয় আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সেই বিকার মাত্র ত মৃত্যু নহে। কালের গতি অলক্ষ্য, কিন্তু অননুভবনীয় নহে। অতীতে কালের পদচিহ্ন দেখিতেছি, ভবিষ্যতে কালের ঘন অন্ধকার দেখিতেছি। অর্জ্জুন যেমন শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া, ভীষ্মকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া শরশয্যায় শায়িত করিয়াছিলেন, মৃত্যু সেইরূপ কালকে অগ্রসর করিয়া, মনুষ্যকে নিহত করে। এক মুহূর্ত্ত

জীবন ও মৃত্যু।

কাল আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। নিঃশব্দ গতিতে, সমীরণ অথবা স্রোতস্বতীর ন্যায় কালের স্রোত বহিতেছে। সম্মুখে কিছু দেখা যায় না। পশ্চাতেও অধিক দূর দেখিতে পাওয়া যায় না, ইচ্ছা করিলে ফিরিয়া চাহিতে পারা যায় না। স্রোতের মুখে আমরা তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়াছি, কিছুক্ষণ পরে সে স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইব, আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

৪৫

এই নদীতে কর্ণধার হইলে কেমন

বোধ হয়। জীবনের তরণী কোথা হইতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, জানিতে পারিলে কত সুখ! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ কে? যে ত্রিকাল বর্ত্তমানের মত দেখে, সেই সর্ব্বদর্শী, যে অমর, সেই ত্রিকালদর্শী। ত্রিকালদর্শী না হইলে অমর হইয়া কি লাভ? চিরকাল শুধু বাঁচিয়া থাকিয়া কি হইবে? কালের পটে যাহা কিছু বিচিত্র আছে, ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইব, তবে ত তপস্যা সাধনা সার্থক।

৪৬

মৃত্যুসম্বন্ধিনী চিন্তার ফল দুই—

জীবন ও মৃত্যু।

মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, অথবা মৃত্যুর রহস্য অভেদ্য স্বীকার করা। সনৎ-সুজাত মৃত্যুকে তৃণময় ব্যাঘ্রের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তৃণ-ময় ব্যাঘ্র যেমন ভীষণদর্শন, প্রকৃত-পক্ষে সেরূপ ভীষণ নহে; মৃত্যুও সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর। মৃত্যুভয় তাহা হইলে আর থাকে না। এই জন্য প্রাচীন মুনি, ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানি-গণ মৃত্যুকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করি-তেন। আর এক দিকে কেহ কেহ মৃত্যুর রহস্য জ্ঞানাতীত বিবেচনা করিয়া সে চিন্তা পরিত্যাগ করে।

পরিত্যাগ করে বলিলে বোধ হয়, ঠিক বলা হয় না, কারণ অপরিতৃপ্ত কৌতূহল লইয়া সহজে নিবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব নহে। মৃত্যু সম্বন্ধে একটা না একটা বিশ্বাস—হয় দৃঢ় বিশ্বাস, না হয় শিথিল বিশ্বাস—নিশ্চিত হয়। অধিকাংশ লোক বিশেষ বিবেচনা না করিয়া একটা কিছু আছে, এই রকম একটা অস্পষ্ট বিশ্বাসকে মনে স্থান দেয়। মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতে পারি না, এই বিশ্বাস হইলে জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ আরও দৃঢ় হয়। আত্মার চিরন্তন ভ্রমণপথে মৃত্যুকে যে

ভয়েব কারণ বিবেচনা করে না, তাহার পরলোকের প্রতি সমধিক অনুরাগ হয়, যে মৃত্যুকে জ্ঞানাতিরিক্ত বিবেচনা করে, সে ইহলোকের চিন্তাতেই সর্ব্বক্ষণ মগ্ন থাকে।

৪৭

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিবর্গ ও আধুনিক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কি প্রভেদ, এ বিচার সদা সর্ব্বদাই উঠিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা অবশ্য বলিবেন যে, প্রাচীনেরা আধুনিকদিগেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইয়োরোপীয়েরা বলেন যে, আধুনিক

পণ্ডিতেরা জগতের অধিক হিতসাধন করিতেছেন। ইয়োরোপে তপস্তা বনবাসের বিড়ম্বনা নাই, পূর্ব্বে ঋষিগণ বনে বাস করিতেন। এ দুই মতে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বকালে চিন্তা মৃত্যুমুখী ছিল, এখন চিন্তা জীবনমুখী। পূর্ব্বে পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম লইয়া সকলে চিন্তা করিত, এখন সকলে বিবর্ত্তবাদ লইয়া ব্যস্ত। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ নির্জ্জনে তপস্তা করিতেন, এখন পণ্ডিতেরা সমাজবিপ্লব কিরূপে সাধিত হয়, তাহাই চিন্তা করেন। পূর্ব্বে লোকশিক্ষকেরা ত্যাগ শিখাইতেন, এখন

জীবনের সুখভোগের নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। প্রাচীনেরা বল্কল ধারণ করিতেন, আধুনিকেরা অঙ্গরাগে ব্যাপৃত। পূর্ব্বে বৃদ্ধ রাজা রাজত্ব ত্যাগ করিয়া বনে যাইতেন, এখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, রাজারা পরের রাজত্ব হরণ করিবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই প্রভেদ উপায়ের প্রভেদ মাত্র, উদ্দেশ্যে কোন প্রভেদ নাই। জীবনের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করাই সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভোগসুখে সেই শ্রেষ্ঠতা সম্পাদিত হয় না

বিবেচনা করিয়া, ঋষিগণ জীবনের বহির্দেশে সুখের অন্বেষণ করিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলে কেবল লালসা বৃদ্ধি হয় মাত্র, সুখ পাওয়া যায় না। দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে নিগ্রহ করাই সুখের একমাত্র উপায়। শরীর নশ্বর, শরীর যাহা কিছু সুখভোগ করিতে চায় তাহাও নশ্বর, অতএব শারীরিক সুখভোগে জীবন অতিবাহিত করা অকর্ত্তব্য। শরীরের সুস্থতা ও স্বচ্ছন্দতা যে নিষ্প্রয়োজন, এ কথা তাঁহারা বলিতেন না, কিন্তু শরীরের

প্রাধান্য তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। আত্মার আশ্রয় স্থান বলিয়াই শরীরের যত্ন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শরীরকে স্বেচ্ছাধীন হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। জীবন কিসে শ্রেষ্ঠ হয়? ইন্দ্রিয়লব্ধ ভোগসুখে নিরত রহিলে সুখও নাই, তাহাতে জীবনও শ্রেষ্ঠ হয় না। ইন্দ্রিয়বৃত্তি যতই বাড়িবে, মনুষ্য ততই পশুর মত হইয়া উঠিবে। জীবনের বাহিরে চল, লোকালয়ের প্রলোভন ত্যাগ কর, বনে বনে ভ্রমণ কর, নির্জ্জনে পূর্ণ সত্তার চিন্তা কর, ইন্দ্রিয়গ্রামকে অনুক্ষণ দমন কর, তাহা

হইলে জীবন শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা হইলে সুবিমল অনন্ত সুখ ভোগ করিবে। যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, যাহা স্পর্শ করিতে পারা যায় না, তাহারই চিন্তা কর, জীবনের এই ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষ জ্ঞানের আলোক দ্বারা আলোকিত কর। জীবনেব সুখ, জীবনেব শ্রেষ্ঠতা, জীবনের শান্তি, জীবনের বল, সমুদয় জীবনের বাহিরে। জীবনের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া জীবনের সুখভোগ কর। প্রাণবায়ু যেমন শরীরের বাহিরে অবস্থিত, জীবনের জীবনী-

শক্তি সেইরূপ জীবনের বহির্ভাগে অবস্থিত। দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু দ্বারা যেমন আমরা প্রাণধারণে সক্ষম হই না, যেমন পলে পলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের আবশ্যক, সর্ব্বত্রগামী সমীরণের মনুষ্য শরীরে প্রবেশ যেমন আবশ্যক, জগদন্তর হইতে ইহজগতে তেমনি নূতন জীবনের আগমন আবশ্যক। বায়ুর সঙ্গে শরীরের যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবনের সহিত জীবনাতীতের সেইরূপ সম্বন্ধ। সমীরণের মুক্ত প্রবাহের ন্যায় অনন্ত জীবনের অসংখ্য নির্ঝর হইতে নির্ম্মল জীবনস্রোত

বহিয়া আসিতেছে, সেই স্রোতে আমাদের উত্তপ্ত জীবন শীতল হইতেছে, জীবনের শীতল, কোমল, উর্ব্বর ক্ষেত্রে বিশ্বাসের কল্পতরু দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছে। পৃথিবীর আলোকদাতা সূর্য্য যেমন পৃথিবীর বাহিরে, জীবনের আলোকদাতা জ্ঞানসূর্য্য সেইরূপ জীবনের বাহিরে। লোকালয়ের গণ্ডগোল, জীবনের অন্ধকার দূরে রাখিয়া, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও। জ্ঞানের আলোক যেন অন্ধকারে, যেন সংসারের কুজ্মাটিকায় না আবৃত হয়। গ্রীসদেশীয় প্রথিতনামা পণ্ডিত ডাইও-

জিনিস আলেকজাণ্ডারের অনুরোধানুসারে এইমাত্র প্রার্থনা করেন,—'তুমি সূর্য্যালোক আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়াছ। আলোকের পথ ত্যাগ কর, আমি রৌদ্র সেবন করি। তোমার নিকট আমার অন্য প্রার্থনা নাই।'

৪৮

আধুনিকেরা বলেন, জীবনের বাহিরে কি আছে, তাহার অনুসন্ধানেই জীবন সমাপ্ত করিলে কি হইবে? জীবনের বাহিরে কি আছে, তাহা কোন কালেই আমরা প্রকৃতরূপে

জানিতে পারিব না। যাহা কিছু আমরা জানি, তাহা অনুমান অথবা বিশ্বাসমূলক। যাহা কেবল অনুমেয়, তাহার বিচারে চিরকাল কাটাইলে কি হইবে ? জীবনের বাহিরে যাহাই থাকুক, জীবনের ভিতরে যাহা আছে, তাহাই আমাদিগের আয়ত্ত, তাহাই লাভ করিবার আমাদিগেব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আকাশেব বিদ্যুৎ আমা-দের গৃহে প্রদীপরূপে জ্বালাইব, পৃথিবীব গর্ভে যে ন ‌ ‌ল রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা অধিকৃত করিব, জীব-নের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত করিব—

এই সকল আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তপস্যা, যোগ প্রভৃতি হয় মূর্খের, না হয় বাতুলের কাজ। অনাহারে বনে বসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চেষ্ট রহিলে কি ফলোদয় হয়? জীবনধারণের যে সকল নিয়ম আছে, তাহা লঙ্ঘন করিলেই দোষ। জীবনের পরে কি আছে, তাহা জানিবার আমাদের সাধ্য নাই, কিন্তু জীবনের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আমরা জানি না, কিন্তু চেষ্টা করিলে জানিতে পারি, এবং জানিলে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা। জগতে যাহা কিছু দেখি-

তেছি, সমুদয় আমাদের সুখের জন্য. সৃষ্ট হইয়াছে; আমরা যতই অনুসন্ধান করিব, ততই সুখের নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইবে। যাঁহারা মৃত্যুচিন্তায় চিরজীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের দ্বারা জগতের কি উপকার হইয়াছে? জীবন একটা বৃহৎ উদ্যানের স্বরূপ, মৃত্যু সেই উদ্যানের নির্গমদ্বার। উদ্যানে নানাবিধ ফলফুলের বৃক্ষ আছে, কোন স্থানে নির্ঝর বহিতেছে, কোথাও দুর্গম জটিল, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য; কোথাও কত প্রকার ফল মূল ওষধি আছে,

কোথাও কোন নিভৃত স্থানে রত্নরাজি লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমরা সকলে এই উদ্যানের মধ্যে বিচরণ করিতেছি। যাহারা উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ না করিয়া, অথবা কোন স্থলে কোন ভয়াল অথবা বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া একেবারে নিক্রান্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, অথবা নিক্রমণ-দ্বার দেখিয়া বাহিরে কি আছে, দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়, তাহাদিগের বুদ্ধির কি প্রশংসা করিতে হইবে? সে দ্বারে মাথা খুঁড়িলেও বাহিরে কি আছে কিছুই জানা যায় না, অথচ

জীবন ও মৃত্যু ৷৷

জীবনের উদ্যানেও দীর্ঘকাল কেহ থাকিতে পাইবে না। সকলকেই সেই দ্বার দিয়া বাহিরে যাইতে হইবে, কিন্তু একবার বাহির হইলে আর ফিরিয়া আসিবার সাধ্য নাই। সেই রন্ধ্রশূন্য বজ্রকঠিন দ্বারের সম্মুখে বসিয়া অনর্থক বাহিরে দেখিবার বিফল চেষ্টা শ্রেয়, না উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া কোথায় কি ফল আছে, কোথায় কি রত্ন আছে, অন্বেষণ করা শ্রেয়? উদ্যানে আমরা নিজে ভ্রমণ করিয়া অন্যকে পথ দেখাইয়া দিই, যাহাতে তাহাদের পথভ্রম না হয়,

জীবন ও মৃত্যু।

যে সকল বিপদ হইতে আমরা উদ্ধার হইয়াছি, তাহারা যেন সে সকল বিপদে না পতিত হয়। উদ্যানের বাহিরে যাহা আছে, তাহা আমরা উদ্যানের ভিতর যে পর্য্যন্ত আছি, সে পর্য্যন্ত জানিতে পারিব না। কৌতূহলনিবৃত্তি করা কঠিন, কিন্তু কৌতূহলপূর্ণ করিবার নিস্ফল চেষ্টায় দুর্লভ জীবন সমাপন করা মূঢ়ের কর্ম্ম। জীবন প্রত্যক্ষ, জীবনের ফলও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত।

৪৯

জীবন ও মৃত্যু।-

অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীনে ও আধুনিকে যতটা মতভেদ মনে করা যায়, প্রকৃত পক্ষে সেরূপ মতভেদ নাই। জীবনের বিবৃতি সংসাধন করাই আমাদের একমাত্র ইচ্ছা। প্রাচীনেরা ইহ-জীবনকে নিতান্ত অসার বিবেচনা করিয়া অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত হইতেন, কিন্তু তাঁহারাও অজ্ঞাতসারে জীবনের সীমা বিস্তৃত করিতেন, অন্য রাজ্যের অংশ অধিকৃত করিয়া জীবনের সহিত সংযোজিত করিতেন। প্রাচীনই হউন অথবা আধুনিকই হউন, জীব-

নের পূর্ণ উন্নতির পথ কেহই নির্দেশ করিতে পারেন নাই; যদি কেহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মানব জাতি এখনও সে পথের অন্ত দেখিতে পায় নাই। জীবন অসম্পূর্ণ, প্রকৃতি অসম্পূর্ণ, উন্নতির উপায় অসম্পূর্ণ। জীবনের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা প্রাচীন কালেও সম্পাদিত হয় নাই, এখনও সম্পাদিত হয় নাই। প্রাচীনের অভাব আধুনিক মোচন করিতেছেন, আধুনিকের অভাব ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা মোচন করিবেন। যেমন এক অভাব পূর্ণ

হইতেছে, অমনি আর এক নূতন অভাব উৎপন্ন হইতেছে। জীবনে পূর্ণতা অসম্ভব; কারণ মৃত্যু নহিলে জীবন পূর্ণ হয় না। পূর্ণতা আমরা কোন মতে পাইতে পারি না; আংশিক পূর্ণতার অধিক আর কিছু আমাদের প্রাপ্য নাই। যাঁহারা মানব জাতির মঙ্গল কামনা করেন, যাঁহারা জগতে সত্য প্রচার করেন, তাঁহারা পূর্ণের অংশ লাভ করিবার চেষ্টা করেন। আংশিক পূর্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি মানবজাতির উন্নতি ও অবনতির এক-মাত্র কারণ।

৫০

জীবনের অথবা মানব প্রকৃতির কল্পিত পূর্ণতা নাই এমত নহে। কল্পনার অসাধ্য কিছুই নাই। জীবনের কল্পিত আদর্শ চিরকালই আছে। কেবল কল্পনা নহে, সাক্ষাৎ আদর্শের ও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য বিশেষের চরিত্র আদর্শস্বরূপ, একথাও সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও

পূর্ণস্বভাব বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। কিন্তু এই পূর্ণতা, আদর্শ চরিত্র, ইহাও জীবনের পক্ষে অসম্পূর্ণ। ব্যক্তিগত সুখ ও সম্পূর্ণতা, জাতিগত হইতে পারে না। যাহাতে এক জনের সুখ, তাহাতেই আর এক জনের অসুখ। জীবনের এমন কোন আদর্শ নাই, যাহার সহিত জীবন মাত্রেরই সামঞ্জস্য সম্ভব।

অতএব জীবন অসম্পূর্ণ, সুখ অসম্পূর্ণ। পূর্ণতাপ্রাপ্তির লালসা ও সেই চেষ্টা সর্ব্বদা মানবহৃদয়ে প্রবল। প্রাচীনের ধ্যান, আধুনিকের বিজ্ঞান,

জীবন ও মৃত্যু।

মৃত্যুর চিন্তা, জীবনের সেবা, সমুদয়েরেই উদ্দেশ্য এক। জীবনের নিত্য পরিবর্ত্তন, নিত্য উত্থানপতন, নিত্য হ্রাসবৃদ্ধি, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত উপমিত হইতে পারে, কেবল জীবনে পূর্ণিমার উপমা নাই। জীবনের চক্র জ্যোৎস্নাপক্ষের চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। শেষ কলা মৃত্যু। মৃত্যু হইলে জীবন পূর্ণ হয়, কিন্তু সে পূর্ণিমার চন্দ্র আমরা দেখিতে পাইনা। অথচ দর্শনাকাঙ্ক্ষাও অনিবার্য্য। এই জন্য জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তাও অনিবার্য্য এবং সিদ্ধান্তশূন্য বলিয়া অনন্ত।

জীবন ও মৃত্যু ।-

এই চিরস্রোত চিন্তার একমাত্র সীমা আছে। যখন যুক্তি ত্যাগ করিয়া মানুষ বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন শান্তি ও সান্ত্বনার মুখ দেখিতে পায়। নতুবা জীবন ও মৃত্যুর রহস্য অভেদ্য।

কিন্তু বিনা যুক্তিতে যে বিশ্বাস করে, যাহার পরলোকে অথবা মৃত্যু সম্বন্ধে বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, অথবা অনায়াসলব্ধ, তাহার বিশ্বাস শিথিলমূল। বংশপরম্পরায় বিশ্বাস চিন্তার অভাব প্রকাশ করে। সৌভাগ্যবশতঃ এই জাতীয় মনুষ্যসংখ্যাই পৃথিবীতে

অধিক। তাহা না হইলে সকলে জীবনের কিয়দংশ এই কূট চিন্তায় অতিবাহিত করিলে অনর্থ ঘটিত। জীবন ও মৃত্যু মোটামুটি ধরিতে গেলে পরস্পরের সহিত নির্লিপ্ত। জীবনের রাজ্য স্বতন্ত্র। মৃত্যুর রাজ্য স্বতন্ত্র। দুই রাজ্যে বিবাদ নাই। যে এক দেশের প্রজা, তাহার অন্য দেশের সহিত সম্বন্ধ নাই। স্থূল কথা এই। সূক্ষ্ম বিচার স্বতন্ত্র। সমাজ ও সংসার স্থূল কথাতেই পরিচালিত হয়।

জীবন ও মৃত্যুর চিন্তার যেমন

অন্ত নাই, সেইরূপ তদ্বিষয়িণী বাণীরও সমাপ্তি নাই। সমাপ্তি অর্থে সম্পূর্ণতা, পূর্ণতাজনিত বিরতি। এরূপ বিরতি এমন বিষয়ে অসম্ভব। যেখানে এক জনের চিন্তার সমাপন, সেইখানেই আর এক জনের চিন্তার আরম্ভ। এইরূপ কালসূত্রগ্রথিত অসংখ্য চিন্তামালা নিয়ত মলিন হইতেছে, পুনরায় নবীন কুসুমে নবগ্রথিত হইতেছে।

৫১

জীবন ও মৃত্যুর এই যে অনন্ত ধারাবাহিক চিন্তা প্রত্যেক চিন্তাশীল

জীবন ও মৃত্যু।

ব্যক্তির মনে অল্প বা অধিক বেগে কোন সময় না কোন সময় প্রবাহিত হয় ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। কিন্তু এই সমস্যা পূরণ করিবে কে, কে এই বিচিত্র গম্ভীর রহস্য ভেদ করিবে ? এ চিন্তা নিষ্ফল মনে করিয়া অনেকেই ইহা ত্যাগ করে। তথাপি সাধ্যমত স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শ্রেষ্ঠ মানবের কর্ত্তব্য। কেহ পরলোকে বিশ্বাস করে, কেহ করে না। আত্মার অমরত্বে কেহ বিশ্বাস করে, কেহ করে না। বিশ্বাসী

জীবন ও মৃত্যু।

অবিশ্বাসী সকলেই মৃত্যুশূন্য জীবনের কামনা করে। প্রধানতঃ তাহার কারণ মৃত্যু অলঙ্ঘ্য; জীবন যেরূপ প্রত্যক্ষ মৃত্যু সেরূপ প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু অমোঘ নিয়ম বলে জীবনের পর মৃত্যু আগমন করে। মৃত্যু অপ্রত্যক্ষ, এই জন্য ভয়াবহ।

৫২

মানিলাম অমরত্ব সম্ভবপর হইতে পারে। বহু সাধনায় অথবা কোন দ্রব্যগুণে মৃত্যু হইতে কেহ রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে। এই কল্পনা হইতে যে সুখ হয় তাহা পূর্ব্বেই

নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু অপর পক্ষে কত সহস্র প্রশ্ন উঠিতে পারে! যে ব্যক্তি এই দুর্লভ অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে সে কি রোগতাপজরা প্রভৃতির বশীভূত হইবে, না এ সমুদয়কে অতিক্রম করিবে? সে কি সংসারী হইবে না বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিবে? সংসারী হইলে কি ক্রমান্বয়ে নব নব পরিবার সংগ্রহ করিবে? কারণ সে অমর কিন্তু তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা ত অমর নহে। কিসের জন্য অমরত্বের কামনা? সুখের জন্য ত। সুখের তৃষ্ণা যদি গেল ত জীবনের

প্রতি আর কিসের অনুরাগ রহিল ? অমরত্ব লইয়া কোন্ সুখ ভোগ করিবে ? স্থিরযৌবন, যৌবনের উপভোগ সমূহ কামনা করিবে ? জরাগ্রস্ত যযাতি পুত্রের যৌবন গ্রহণ করিয়া সহস্র বর্ষ ভোগ করিবেন অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহস্র বর্ষ পূর্ণ না হইতেই পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া স্বীয় জরা পুনরায় গ্রহণ করিলেন কেন ? যযাতির অভিজ্ঞতা এই যে, এক ব্যক্তি সমুদয় ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্ত হইলেও ভোগতৃষ্ণা নিবারিত হয় না, লালসা দমন

ব্যতীত লালসা নিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই। সহস্র বৎসর যে যৌবন ভোগ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, যৌবন ত্যাগ করিয়া জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী বৎসর, অনন্ত কাল ধরিয়া সেই যৌবন ধারণ করিতে কাহার না বিষতুল্য বোধ হয়?

যৌবন, জরা, শৈশব, কৈশোর, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন, পুনরাবর্ত্তনই কি অনন্তকাল সুখজনক হইতে পারে? এরূপ কল্পনাও ক্লেশকর।

জীবন ও মৃত্যু।

বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া পার-মার্থিক সুখে কি অনন্তকাল এই মর্ত্ত্য-লোকে যাপন করিতে ইচ্ছা করে ? সে সুখের নামই ত পারত্রিক সুখ, তাহা ত ঐহিক সুখ নহে। সংসারি সুখ হইতে বিরত হইলে সংসারে কমনীয় আর কি রহিল ? কিসের জন্য অনন্ত জীব-নের প্রার্থনা করিব ? জীবনবন্ধন ছিন্ন হইলেই যে সুখ পূর্ণ হয়. সে সুখের জন্য অনন্ত জীবন কে কামনা করিবে ?

অনব হইলে ভোগসুখস্পৃহায় বা সংসারসুখে নিরত থাকিয়া অনন্ত

জীবন ও মৃত্যু।

কাল অতিবাহিত করা অত্যন্ত ক্লেশ-দায়ক। যে অমর তাহার পার-মার্থিক সুখ সম্পূর্ণ হয় না। তবে অমরত্বের জন্য মানুষ লালায়িত কেন? শুধু অমরত্ব মানুষের অপ্রাপ্য বলিয়া।

বহির্জগতে অমরত্বের কোন উপাদান নাই। সকলই পরিবর্তন-শীল, ধ্বংসশীল, এই পৃথিবীই হয়ত কোন দিন চন্দ্রলোকের ন্যায় প্রাণী-শূন্য হইবে। চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রও কালে লুপ্ত হইতে পারে। নশ্বর জগতে অবিনশ্বর জীব কি করিবে?

৫৩

এই কারণে পূর্ব্বকালে মহাত্মাগণ জীবন্মুক্তির জন্য যত্নবান হইতেন, মৃত্যুমুক্তির তরে প্রয়াসী হইতেন না। জীবন হইতে মুক্ত না হইলে ত মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। অমর হইলে, মৃত্যুকে পরাভব করিলে ত জীবনকে ত্যাগ করা যায় না। জীবন অনন্ত হইলে তদপেক্ষা দুর্ব্বহ ভাব আর কি হইতে পারে? যাহাতে বারম্বার জীবন ধারণ না করিতে হয়, সেই সাধনাই উৎকৃষ্ট

সাধনা। মৃত্যু ত ভয়ানক নহে, জীবনই সকল দুঃখের আকর।

৫৪

মৃত্যু যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, অমরত্ব যদি অমোঘ হইত, তাহা হইলে সেই অনন্ত জীবন কি ভীষণ যন্ত্রণাময় হইত। যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা, দুঃখের পর দুঃখ, ক্লেশের পর ক্লেশ। মৃত্যু নামক সকল যন্ত্রণার যে সীমা তাহা থাকিত না। খন মানুষ অমরত্বের তরে যেরূপ লালায়িত তখন মৃত্যুর জন্য সেইরূপ লালায়িত হইত।

অতএব স্বেচ্ছামৃত্যু অমরত্বের

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর ভীষ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যু ও অমরত্ব এই উভয়ের মধ্যে তিনি অবশেষে মৃত্যুকেই কেন শ্রেয় বিবেচনা করিলেন? মহা • সমরক্ষেত্রে শরশয্যায় শয়ান হইয়া তিনি জীবনের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন কেন? ইচ্ছা করিলে তিনি ত ব্রণমুক্ত হইয়া পুনরায় সুস্থ হইতে পারিতেন, তবে তিনি সূর্য্যদেবের উত্তরায়ণে আবর্ত্তন• কাল পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিতে চাহিলেন কেন, ও তৎপরে কেনই বা দেহান্তে কৃতসঙ্কল্প হইলেন?

জীবন ও মৃত্যু।

ভীষ্ম মহাজ্ঞানী—বুঝিয়াছিলেন যে এই দেহ, এই জীবন যথাকালে বিসর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য, এ ভার চিরকাল বহন করা সুখের নহে। জীবনের পর মৃত্যু—এ নিয়ম যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ ও অলঙ্ঘ্য, তদ্রূপ মঙ্গলময়।

সমাপ্ত।

———